জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা

শহীদুল জহির

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা

শহীদুল জহির

উনিশ শ পঁচাশি সনে একদিন লক্ষ্মীবাজারের শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেনের যুবক আবদুল মজিদের পায়ের স্যান্ডেল পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি বিধানে ব্যর্থ হয়ে ফট করে ছিঁড়ে যায়। আসলে বস্তুর প্রাণতত্ত্ব যদি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতো, তাহলে হয়তো বলা যেত যে, তার ডান পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেলের ফিতে বস্তুর ব্যর্থতার জন্য নয়, বরং প্রাণের অন্তর্গত সেই কারণে ছিন্ন হয়, যে কারণে এর একটু পর আবদুল মজিদের অস্তিত্ব পুনর্বার ভেঙে পড়তে চায়। রায়সা বাজারে যাওয়ার পথে কারকুন বাড়ি লেন থেকে বের হয়ে নবাবপুর সড়কের ওপর উঠলে তার স্যান্ডেলের ফিতে ছিঁড়ে যায় এবং সে থেমে দাঁড়ায়। তখন নবাবপুরের মানুষ আর যানবাহনের শব্দ ও চাঞ্চল্যের ভেতর সে আরো অধিক কিছু অনুভব করে। মানুষ আর গাড়ি যে শব্দ সৃষ্টি করে, যে শব্দ সম্পর্কে মানুষ সব সময় সচেতন হয় না, তার বাইরে, এক ঝাঁ ঝাঁ শব্দের জগতে সে ঢুকে পড়ে। সে দেখে, নবাবপুরের ওপর অপরাহ্নের ম্লান আকাশ উইপোকায় ছেয়ে আছে আর পলায়নপর উইয়ের পেছনে অসংখ্য কাক হুটোপুটি করে। তার মনে হয় যেন কাকের চিৎকার এবং উইপোকার নিঃশব্দ পলায়ন প্রচেষ্টার দ্বারা নবাবপুর রোডের ম্রিয়মাণ বিকেলের ভেতর এক ধরনের নীরব সন্ত্রাসের অনুভব ছড়িয়ে পড়ে। তখন তার ইন্দ্রিয় আর একটি বিষয়ে সচেতন হয়, সে খুব নিকটে লাউড স্পিকারের শব্দ শোনে। নবাবপুর রোডে সে সময় অবস্থানকারী প্রতিটি লোকের মতো সে এই শব্দের উৎস সন্ধান করে এবং তার সামনে, রাস্তার উল্টোদিকে পুলিশ ক্লাবের কাছে মাইক্রোফোন হাতে আবুল খায়েরকে দেখতে পায়। আবদুল মজিদ দেখে, আবুল খায়ের একটি দাঁড় করানো রিকশায় বসে মাইক্রোফোন মুখের কাছে তুলে কথা বলে আর রিকশার হুডের ওপর বসানো চোঙের ভেতর থেকে তার কথা বিস্ফারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। আবদুল মজিদ তখন, সেই ক'টি মুহূর্ত, কাক এবং উইপোকার ওপর চোখ রেখে আবুল খায়েরের কথা শোনে। আবুল খায়ের কি বলে তা নবাবপুরের ওপর দিয়ে তখন চলমান সকলেই বুঝতে পারে। আবুল খায়ের বলে, আপনেদের ধন্যবাদ। সকলে তার এই কথা তেমন বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই বুঝতে পারে, কারণ যারা তার কথা শুনতে পায় তারা সকলেই জানে কোন প্রসঙ্গে আবুল খায়ের এই কথা বলে। তারা জানে আগের দিন বিভিন্ন দলের আহ্বানে যে হরতাল হয়েছিল, পরদিন, কাকের চিৎকার এবং যান্ত্রিক শব্দের ভেতর আবুল খায়ের তার জন্য সকলকে ধন্যবাদ দেয়। আবদুল মজিদের মনে হয়, তার হৃদয়টি বহুদিন থেকেই বিদীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু এই দিন, উইপোকার হত্যাযজ্ঞের বিষণ্ন বিকেলে আবুল খায়েরের কথা শুনে তার হৃদয়ের তন্তু তার স্যান্ডেলের ফিতার মতো পুনরায় ছিন্ন হয়। আবদুল মজিদ যখন তার দৃষ্টি আবুল খায়েরের দীর্ঘ এবং তরুণ শ্মশ্রু আর নীল রঙের জোব্বার ওপর রাখে, তার মনে হয়, আকাশে যত কাক ওড়ে সেগুলো আবুল খায়েরের জোব্বার ভেতর থেকেই যেন বের হয়ে আসে। তার মনে হয়, এ সেই কাক; সে তো জানে কাকের সঙ্গে আবুল খায়েরের পারিবারিক সূত্রে ঘনিষ্ঠতা। তার পিতা বদরুদ্দিন মওলানার সে এক অজ্ঞাত রহস্যময় ভালোবাসা ছিল কাকের জন্য। লক্ষ্মীবাজারের লোকদের মনে পড়ে, একাত্তর সনে বদু

মওলানা নরম করে হাসত আর বিকেলে কাক ওড়াত মহল্লার আকাশে। এক থালা মাংস নিয়ে ছাদে উঠে যেত বদু মওলানা আর তার ছেলেরা। মহল্লায় তখনো যারা ছিল, তারা বলেছিল, বদু মওলানা প্রত্যেকদিন যে মাংসের টুকরোগুলো আকাশের দিকে ছুড়ে দিত, সেগুলো ছিল মানুষের মাংস। কারণ, মহল্লার সবচাইতে প্রাচীন মুসলমান পরিবারটির প্রধান, খাজা আহমেদ আলী বলেছিলেন যে, একদিন এক টুকরো ছুড়ে দেয়া মাংস কাকেরা ধরতে ব্যর্থ হলে সেটা এসে পড়েছিল তার বাড়ির ছাদের ওপর। তিনি ছাদের ওপর বিকেলের একচিলতে রোদে বসে অতীত যৌবনের স্মৃতির ভেতর নিমজ্জিত হয়ে ছিলেন, তখন মাংসখণ্ডটি তার পায়ের কাছে এসে পড়ে। তিনি কিছুক্ষণ দেখে অনুধাবন করেন যে টুকরোটির গায়ের একদিকে চামড়া রয়ে গেছে এবং তিনি দেখেন যে এই চামড়া একেবারে মসৃণ। এসব কথা মহল্লার সকলে পরে জেনেছিল। সেই বিকেলে মাংসটুকরোটি হাতে তুলে নিয়ে তিনি দেখেন যে, সেটার গায়ে ছোট্ট মুসুরের ডালের মতো একটি পাথরের ফুল। তিনি হাহাকার করে ওঠেন, দুহাতের অঞ্জলিতে টুকরোটি নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে বড় ছেলে খাজা শফিকের সহায়তায় সেটা দাফন করেন নিজের বাড়ির আঙিনায়। তারপর মাগরিবের নামাজ পড়ার সময় তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। একটি অদেখা মেয়ের জন্য লক্ষ্মীবাজারের এক বিষণ্ন বৃদ্ধের হৃদয় সেদিন ভেঙে পড়ে। এখন তার বাসার আঙিনায় তার নিজের আর তার ছেলের জোড়া কবর। অন্য একটি টুকরো, সেটা ছিল পায়ের বুড়ো আঙুলের, পেয়েছিল এক অচেনা পথিক, রাস্তার ধারে ফুটপাতের ওপর। আবু করিমের বড় ছেলে সেটা দেখেছিল এবং লোকে সব জেনেছিল। আঙুলটির নখ খুব বড় এবং শক্ত ছিল এবং নখের ওপর ঘন এবং মোটা লোম ছিল। নখে লাগানো ছিল টকটকে লাল নখরঞ্জক। রঞ্জকের কথা শুনে সবাই ভেবেছিল যে, সেটা একটি মেয়েমানুষের পায়ের আঙুল, তারপর ঘন মোটা কেশের কথা শুনে সবাই ভেবেছিল, সেটা পুরুষের। তারপর সবাই ভেবেছিল সেটা একজন হিজড়ের হবে। আঙুলের এই কাটা টুকরোটির কি হয়েছিল, তা কেউ জানে না। কিন্তু আবু করিমের বড় ছেলেটি রায়সা বাজারের দোকান থেকে ফেরার পথে একদিন নিখোঁজ হয়। অন্য আর একটি টুকরো পড়েছিল জমির ব্যাপারির বাড়ির কুয়োতলায়, বিকেলে ভাতের চাল ধোয়ার সময়, হাঁড়ির ভেতর। এটা ছিল একটি কাটা পুরুষাঙ্গ। হাঁড়ির ভেতর এসে পড়তেই জমির ব্যাপারির কিশোরী কন্যাটি চমকে উঠেছিল, কিন্তু হাঁড়ির ভেতর থেকে বের করে এনে সে বস্তুটি চিনতে পারে নাই। সে সেটা তার মায়ের কাছে নিয়ে গেলে ব্যাপারির স্ত্রী সেটা দেখে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। তার মেয়ে 'এটা কি মা', 'এটা কি মা' করতে থাকলেও সে তাকে কিছু বলে না। সে মানুষের কাটা জননেন্দ্রিয়টি একটি ন্যাকড়ায় জড়িয়ে রেখে দেয়। রাতে জমির ব্যাপারি বাসায় ফেরার পর তাকে ন্যাকড়া খুলে জিনিসটি দেখালে সে একই সঙ্গে তার স্ত্রী এবং অন্য সকলের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তখন তার সেই মেয়েটি ফিসফিস করে জিনিসটি কি জানতে চাইলে সে বলে, ল্যাউড়া। এরপরেও মেয়েটি জিনিসটি চিনেত পারে না, তার মনে হয়, তার পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে গাল দিল। এরপর জমির ব্যাপারি ন্যাকড়ায় জড়ানো অঙ্গটি সে রাতেই বদু মওলানার বাসায় গিয়ে দিয়ে আসে। এ সবই মহল্লার লোক বিস্তারিত জানতে পারে। বদু মওলানার দ্বিতীয় তরুণী স্ত্রী লতিফা বদু মওলানার সামনে বসে উপহারটির মোড়ক খুলে অনাবৃত করেই তা হাত থেকে ফেলে দেয়, এ মা, জোঁক মনে হয়। বদু মওলানা তার পরেও চৌকি থেকে ওঠে নাই। তখন তরুণী

লতিফা ভালো করে বাতি জ্বেলে একটি পেন্সিলের চোখা আগা দিয়ে খুঁচিয়ে দেখে জিনিসটি চিনে ফেলে এবং বদু মওলানা তখন জানতে চায় জিনিসটি কি। তার স্ত্রী তার কথার উত্তর না দিয়ে নিরুত্তর থাকলে সে শোয়া থেকে উঠে ঝুঁকে পড়ে ভয়াবহ লিঙ্গটা দেখে। তখন তার স্ত্রী বলে, মুসলমানের। এ কথা শুনে বদু মওলানা নির্বাক হয়ে থাকে। বদু মওলানা কেন নির্বাক হয়েছিল সেটা প্রথমে বোঝা যায় না, তবে বদু মওলানা এই ভেবে নিশ্চয়ই বিচলিত হয় নাই যে দেহাঙ্গটি একজন মুসলমানের। বস্তুত একাত্তর সনে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মহল্লায় প্রথম যে ব্যক্তি নিহত হয়, সে ছিল একজন মুসলমান ও অপ্রাপ্তবয়স্ক। বদু মওলানার এই তথ্যটি মনে রাখার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু মহল্লার লোকদের সেটা মনে থেকে যায়। তাদের এই কথাটি আজীবন মনে থেকে যায় যে, একাত্তর সনে মহল্লায় প্রথম নিহত হয়েছিল, আলাউদ্দিন; যে মোটর গ্যারেজে কাজ করত এবং নিহত হওয়ার দিন, তার মায়ের হিসাব অনুযায়ী, তার বয়স হয়েছিল তেরো বৎসর। আলাউদ্দিন নিহত হওয়ার পর মহল্লার লোকদের সেই কথাটিও মনে পড়েছিল, যা এখনো তাদের মনে আছে যে, হাফপ্যান্টের একপাশ গুটিয়ে দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে পেশাব করার সময় তার শিশ্নের ওপর নজর পড়ায় বদু মওলানা ক্ষেপে গিয়েছিল একদিন, হারামযাদা, খাঁড়ায়া খাঁড়ায় মোতচ, খাঁড়ায়া মোতে কুত্তা। তখন আলাউদ্দিন কয়েকদিন পর নির্মমভাবে নিহত হওয়ার শর্ত পূরণ করেছিল। প্রথমত, সে বদু মওলানার কথা শুনে গালের ভেতর জিভ নেড়ে তাকে ভেঙায়, তারপর বলে, কুত্তা তো মুখ দিয়া খায়বি, আপনে অখনথন হোগা দিয়া খায়েন। বদু মওলানাকে এই অশ্লীল কথা বলায়, তার বাপ শুনতে পেয়ে, তাকে পেয়ারা গাছের সঙ্গে বেঁধে বেদম প্রহার করে, আর আলাউদ্দিন 'আর করুম না, আর করুম না' বলে চিৎকার করলে মহল্লার লোকেরা বিষদ জানতে পারে। এর তিন মাস নয় দিন পর, একদিন দুপুরে, মহল্লার লোকজন যখন 'মিলিটারি আইছে', 'মিলিটারি আইছে' বলে কাকের তাড়া খাওয়া উইপোকার মতো দৌড়াচ্ছিল এবং যেদিন প্রথম বদু মওলানা এবং ক্যাপ্টেন ইমরান পরস্পরকে আবিষ্কার করে, আলাউদ্দিনের প্রাণ-বিযুক্ত দেহ মহল্লায় তাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় চিৎ হয়ে আছড়ে পড়ে। তাই বোঝা যায় যে, বদু মওলানা যখন কাটা পুরুষাঙ্গটি দেখে নির্বাক হয়ে থাকে তা এই কারণে নয় যে, তার স্ত্রীর কথায় সে জেনেছে অঙ্গটি একজন মুসলমানের। সে লতিফার কথায় তার এই প্রতিক্রিয়ার মূল বিষয়টি নিজের সঙ্গে দীর্ঘ বোঝাপড়া শেষে ভীরুতার আবরণ খসিয়ে ভোররাতে উদ্‌ঘাটন করে। সে বুঝতে পারে, লতিফা, অপরিচিত একজন পুরুষের যৌনাঙ্গ অবলোকন শুধু করে নাই, এ ব্যাপারে সে অনেক আগ্রহ দেখিয়েছে; সে সেটাকে পুরুষের যৌনাঙ্গ হিসেবে শনাক্ত করেছে। তার পরেও সে ছাড়ে নাই, সে শনাক্ত করেছে যে, সেটা মুসলমানের। বিষয়টি জানা হয়ে যাওয়ার পর বদু মওলানার নির্বাক বিষণ্নতা দূর হয়ে যায়। সে লতিফাকে ডেকে তুলে তিন তালাক দেয়। মহল্লার লোকেরা অনেকে পালিয়ে গেলেও, যারা ছিল, তারা পরে বিস্তারিত সব জানতে পারে। সব ঘটনার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়, কারণ পরদিন বদু মওলানার দ্বিতীয় তরুণী স্ত্রীটি বাসা ত্যাগ করে এবং তার আগে লক্ষ্মীবাজারে রাতজুড়ে একটি নারীকণ্ঠের করুণ এবং একটানা কান্নার শব্দ সকলকে জাগিয়ে রাখে। কেউ তাদের বাসা থেকে এগিয়ে যায় না। বাতি না জ্বেলে, বিছানায় শুয়ে থেকে মহল্লার অবশিষ্ট লোকেরা শনাক্ত করে যে, বদু মওলানার দ্বিতীয় স্ত্রী, সুন্দরী গ্রাম্য তরুণী লতিফা কাঁদে; তার কোনো কষ্ট হয়েছে। সকলে অন্ধকারে জেগে থাকে, কেবল একবার

অসহ্য লাগলে কিশোর আবদুল মজিদ বাতি জ্বালে। পরদিন সকালে আবদুল মজিদের মা, বদু মওলানার বাসায় গেলে সে সেখানে জড়ো হওয়া আরো সব লোককে বলে যে, তার কিছুই হয় নাই। সে ঈশ্বরের প্রশংসা করে এবং সকলকে ধন্যবাদ দেয়। তার বাসায় আগত এই লোকদের ভেতরে সে দুজনের সঙ্গে পৃথক আচরণ করে। প্রথমে সে আবদুল মজিদের বিধবা মাকে বলে যে, এই মহল্লায় এখনো তাদেরই কেবল সাহস রয়ে গেছে। তারপর সে হঠাৎ করে জমির ব্যাপারির শুকনো গালে চপেটাঘাত করে, কিন্তু সে তাকে একটি কথাও বলে না। উপস্থিত জনতা এই সব বিমূঢ় বিস্ময়ে দেখে, যেমন বিমুগ্ধ দর্শক দেখে জাদুকরের ব্যাখ্যাতীত আচরণ, এবং বুঝতে চেষ্টা করে। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না, তারা নীরবে অবলোক করে যায়। তারা দেখে, চড় খাওয়া জমির ব্যাপারি এবং প্রশংসিত আবদুল মজিদের মা– দুজনের চেহারাই একই রকম বিষণ্ন এবং বিপদগ্রস্ত মনে। মার্চের পঁচিশ তারিখের পূর্বের দিনগুলোর নিদারুণ উৎকণ্ঠা আর হীনম্মন্যতা কাটিয়ে বদু মওলানা দ্রুত যে গাম্ভীর্য এবং আত্মপ্রত্যয় অর্জন করে, সেটা এক মুহূর্তের জন্য ভেঙে পড়ার সুযোগে জমির ব্যাপারি তার ভেতরটা দেখে ফেলার সুযোগ পায়। এবং আর-একটি সকাল আসার আগে বাড়ির দরজায় তালা ঝুলিয়ে স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে নিয়ে সে সাড়ে সাত মাসের জন্য নিখোঁজ হয়। চড় খেয়ে সে বেঁচে যায়, কিন্তু আবদুল মজিদের মা তার পরিবারকে ক্ষয়ক্ষতিহীন রাখতে পারে না। বদু মওলানার প্রশংসায় আতঙ্কিত হয়ে এই বিধবা রমণীটি ঘরে ফিরে মেয়েদের সেই কথাটিই বলে, যে কথাটি বদু মওলানা তাকে বলেছিল, কইলো, মহল্লার ভিতরে আপনেগোই অখনও সাহস আছে, কেন কইলো? কেন বলল, সেটা তার চার ছেলেমেয়ের কেউ বলতে পারে না। তারা শুধু শুনে রাখে এবং বিপদগ্রস্ত বোধ করে তাদের মায়ের মতো। তারা তাদের গোটা সংসারে সাহসের কোনো উপাদান খুঁজে পায় না; পরিবারের বয়স্ক পুরুষটি পাঁচ বছর হলো মৃত, একমাত্র ছেলেটির বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর, বড় মেয়েটির বয়স কুড়ি এবং এখনো অনূঢ়া। এরকম একটি পরিবার সাহসের অভিযোগে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কিশোর আবদুল মজিদ সারা দিন কপাল কুঁচকে রাখে, তারপর সন্ধ্যেয় তার মা আর বড় বোনের দিকে তাকিয়ে বলে বাদ দেও, বাদ দেও তো। সে এমনভাবে বলে যে, যেন সে ধরে নেয় তার মা ও বোন তারই মতো একই প্রসঙ্গে চিন্তিত হয়ে আছে, এবং সে দেখে যে তার ধারণাই ঠিক। কারণ তার কথা শুনে তার বোন বলে, হ, এই লয়া ভাবছি না। কিন্তু আবদুল মজিদের মনে হয়, সেই ভাবনার শেষ নাই। সে তারপর, জীবনের বিভিন্ন সময়ে এই উপলব্ধিটা আবিষ্কার করেছিল যে, কৈশোরের আতঙ্কের সেই দিনে সে যে বিষয়টি বাদ দেয়ার কথা বলেছিল সেটা কোনোভাবেই বাদ হয়ে যায় নাই এবং তাই, পনেরো বছর পর সেই একই আলখাল্লা পরা বদু মওলানার ছেলে, খায়ের মওলানার কথা শুনে রায়সা বাজারে বাজার করতে যাওয়া ত্যাগ করে সে ছেঁড়া স্যান্ডেল হাতে বাসায় ফিরে তার স্ত্রী ইয়াসমিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে দেখে ইয়াসমিনের শীর্ণ গ্রীবার গোড়ায় একটি শিরা দপদপ করে, সে সেখানে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে; মোমেনার গলার পাশে এই জায়গায় বেয়োনেট গেঁথে দেয়া হয়েছিল। আবদুল মজিদ জানে, এমনকি কৈশোর উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই সে এই রহস্যটি জেনেছিল যে, তাদের ঘৃণা ছিল। এবং বদু মওলানা হয়তো সেই কথাটি বলেছিল তার মাকে, বদু মওলানার স্ত্রী যেদিন বাড়ি ত্যাগ করে সেদিন সকালে। আবদুল মজিদ বুঝতে পারে যৌবনে পদার্পণ করেও সে কেমন দুর্বল পুরুষ, তার ভয় হয়

এবং সে সর্বদা কেমন শঙ্কিত; কিন্তু তার পরেও সে ভুলে যেতে পারে না ঘৃণার কথা এবং ইয়াসমিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় তার ঘৃণা থেকে ক্রোধ উৎসারিত হয়। হয়তো এই শীতল আগুনের মতো ক্রোধ বদু মওলানা দেখেছিল, হয়তো এখনো দেখে। আবদুল মজিদ বুঝতে পারে, ঘৃণার এই সাহসে তার ভীরু জীবন কেমন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ইয়াসমিনের বাহুর ভেতর নিজেকে সমর্পণ করে সে সুস্থির হতে চায়, এই দ্যাশের মাইনষেরে এ্যালায় বদু মওলানার পোলায় কয়, ভাইছাব। কয়, আপনেগো ধন্যবাদ। জ্বরগ্রস্তের মতো আবদুল মজিদ ইয়াসমিনের গলা জড়িয়ে ধরে 'আপা, আপা' বলে ফোঁপায়। এই ভীরুতায় তার লজ্জা করে, কিন্তু সে কিছু করতে পারে না। সে বুঝতে পারে, সাহসী হওয়াটা প্রয়োজন। কিন্তু সাহসী হওয়ার নিয়ম সে খুঁজে পায় না; জীবনে সে ক্রমাগতভাবে সাহসী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে যায়। প্রথম যেদিন কিশোর আবদুল মজিদ সাহসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, সে ঠিক করেছিল যে, সে গুণ্ডা হয়ে যাবে। কলেজিয়েট স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ার সময় মোমেনাকে বদু মওলানা রাস্তায় গাল দিলে সেদিন সে ভেবেছিল এর প্রতিকার সে একমাত্র গুণ্ডা হয়েই করতে পারে, তখন এই লক্ষ্মীবাজার এলাকায় মোমেনা ছিল একমাত্র মুসলমানের মেয়ে যে গান গাইত। বাসন্তী গোমেজের সঙ্গে তার ভাব ছিল। আর বাসন্তী গোমেজ তাকে সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুলের চার্চে প্রার্থনা-সঙ্গীতে অংশগ্রহণের জন্য নিয়ে যেত। মোমেনা ওয়ারিতে সিলভারডেল স্কুলের এক অনুষ্ঠানে গান গেয়ে ফেরার সময় বদু মওলানা সামনে পেয়ে তাকে গাল দেয়। সেদিন ঘরে ফিরে মোমেনা এক অস্বাভাবিক যন্ত্রণায় ছটফট করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বিলাপ করেছিল, কয় কি, ডিম পারবার যাও। হারামির পোলা আমারে কয় কি, মাগি, ডিম পারবার যাও। মোমেনা আপাকে দেখে আবদুল মজিদের মনে হয়েছিল, তাকে মুরগির মতো জবাই করে কুয়োতলায় ঝাঁকার নিচে চাপা দেয়া হয়েছে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে আবদুল মজিদ তখন সেই অনুভূতিটির বিষয়ে সচেতন হয়েছিল, যার নাম ঘৃণা এবং আক্রান্ত হয়েছিল সেই আবেগের দ্বারা, যার নাম প্রতিহিংসা। কিশোর আবদুল মজিদ অনুভব করতে পেরেছিল যে, সে মোমেনা আপার অপমানের প্রতিশোধ নিতে চায়, কান্দিচ না আপা, মান্দারপোর থোতা ফাটায়া দিয়া আমুনে। কিন্তু সে নিশ্চিতরূপেই বুঝতে পারে নাই সে কিভাবে তা করবে এবং ওই সময় সে সেই বোধটিও আবিষ্কার করে, যার নাম কাপুরুষতা। এই বোধের সামনে দাঁড়িয়ে আবদুল মজিদ ঠিক করে যে, সে করিমের মতো গুণ্ডা হবে এবং বাসন্তী গোমেজের ভাই পঙ্কজ গোমেজের মতো পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে গিটার বাজাবে। কিন্তু তার কিছুই করা হয় না। সে দিনকয় গুণ্ডা হওয়ার পথ খুঁজে বেড়ায়, করিমের সঙ্গে সিগারেট টানে, মেয়ে-দেখে ঠোঁট টেনে ধরে লম্বা করে শিস দেয়। কিন্তু এসব কিছুতে সে হয়রান হয়ে যায়, তার মা এবং মোমেনার জন্যও সে আর এগোতে পারে না। তার মা তার পকেটে সিগারেট পেয়ে তাকে বকাঝকা করে, তারপর মোমেনা তার চৌকির পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে তার দায়িত্বের কথা বলে, তুই এমুন করচ! তর উপরে মার কত আশা, তুই পইড়াশুইনা কত বড় হবি। আবদুল মজিদ মোমেনার মুখের দিকে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে থাকে, তারপর তার মোমেনার যন্ত্রণার কথা মনে পড়ে, কয় কি, ডিম পারবার যাও, মাগি। কিশোর আবদুল মজিদের চোখ সেইদিন অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে যায়। নোনা পানির তল থেকে যেন সে শ্যামল পৃথিবীর দিকে তাকায়, সে মোমেনা আপার মুখ দেখে। তার বুকের ভেতর যে বেদনা হয়, সেই বেদনায় সে জীবনে প্রথম

ভালোবাসার কথা টের পায়। সে মোমেনার শাড়িতে মুখ গুঁজে দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে রাখে; যে মোমেনাকে, সে তখনো জানে না, সে আবিষ্কার করবে মৃত, গলার বাম দিকে কাঁধের কাছে বেয়োনেট বিঁধিয়ে দেয়ার এক হা-করা ক্ষত– মুখটা কাত হয়ে আছে। মায়ের চোখ এবং মোমেনা আপার শাড়ির মাড়ের ঘ্রাণ আবদুল মজিদকে গুণ্ডা হয়ে উঠতে দেয় না এবং এর সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায় যখন স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফলসহ সে নাইনে ওঠে এবং বাসন্তী গোমেজ তাঁদের পারিবারিক পাঠাগারের দরজা তার জন্য খুলে দেয়। বাসন্তী গোমেজের বইয়ের ভেতর সে ধুলো আর ন্যাপথলিনের গন্ধ আবিষ্কার করে এবং একসময় তার মনে হয় যে তার আর রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে বদু মওলানাকে 'মান্দারপো' বলে গাল দেয়ার পথ নাই। বদু মওলানা আবদুল মজিদের শত্রু হয়ে যায় যেদিন সে তার বোনকে কুৎসিত কথা বলে এবং তার বোন অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরায়, এবং সে পুরো মহল্লার শত্রু হয়ে যায় একাত্তর সনে নয়াবাজারের লেলিহান আগুনে আকাশ জ্বলে ওঠার পরের দিনগুলোতে। তখন সে হঠাৎ করে কাঁধের ওপর কালো খোপ খোপ চেকের স্কার্ফটি ফেলে এগিয়ে আসে এবং মহল্লার লোক পাঞ্জাবি মিলিটারির পাশে তাকে দেখে বুঝতে পারে না সে বাঙালি কি না এবং লক্ষ্মীবাজারে যারা শেষ পর্যন্ত টিকে থেকে তারা পুরোটা বছর তার কাক ওড়ানো দেখে। তারা দেখে, বদু মওলানার একাত্তরের প্রথম দিককার চেহারার টানাপোড়েন পঁচিশে মার্চের পর কেমন প্রশান্ত হয়ে আসে এবং মহল্লায় যেদিন প্রথম মিলিটারি আসে সেদিন সে কিভাবে আবিষ্কৃত হয়। মহল্লার লোকেরা সেদিন মাত্র এক ঘণ্টার প্রলয়ের পর বুঝতে পারে তার বিশেষ মর্যাদার কথা। সেদিন এক ঘণ্টায় মিলিটারি প্রতিটি বাড়িতে প্রবেশ করে, মহল্লায় নিহত হয় সাত জন, তিনজন নারী তাদের শ্লীলতা হারায়। নিহত সাত জনের নাম মহল্লাবাসী একটু পরেই জানতে পারলেও ধর্ষিতা তিন জন নারীর নাম কেউ জানতে পারে না; সে তিন জনকে তারা শনাক্ত করতে পারে না, এমনকি বুঝতে পারে না তারা বালিকা, তরুণী, নাকি বৃদ্ধা। কারণ মহল্লার হতবিহ্বল লোকেরা খবরটা বদু মওলানার বাড়ির যে ভৃত্যের কাছ থেকে জানতে পারে, সেই ভৃত্য তিন জন মেয়ের নাম বলতে পারে না। মহল্লায় সাতটি লাশ এবং একটু পরেই কারফ্যু শুরু হওয়ার দুশ্চিন্তা নিয়ে বসে থাকা মানুষদের সে বলে যে, সে মিলিটারিদের মুখে শুনেছে তিন জন মিলিটারি তিন জন রমণীর সঙ্গে সহবাস করেছে। মহল্লার লোকেরা তার কথা ফাঁকা দৃষ্টি মেলে শোনে এবং লাশগুলোর দিকে তাকায়। তারা তাদের পরিবারের বেঁচে থাকা লোকজন গুনে দেখে, পাঁচটি পরিবারে একজন করে কমে যায়, খাজা আহমেদ আলীর পরিবারে কম পড়ে দুজন। মহল্লার লোকজন জানতে পারে যে, মিলিটারি খাজা আহমেদ আলীর বাসায় প্রবেশ করেই তার বড় ছেলে খাজা শফিককে গুলি করে মারে। সে সময় বাড়ির প্রাঙ্গণে পিতা এবং পুত্র দুজনে দণ্ডায়মান ছিলেন। পিতার চোখের সামনে বিনা কারণে খাজা শফিকের প্রাণ-বিযুক্ত দেহের পতন হলে পিতা সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গিয়ে আজান দিয়েছিলেন। মহল্লাবাসী সকলেই পরে বলে যে, হ্যাঁ, তারা আজানের ধ্বনি শুনেছিল। সেই ঝঞ্ঝার সময় যখন দিনের আলো ছিল কৃষ্ণবর্ণ তরলের মতো এবং শব্দের জগৎ পাহাড় ভেঙে পড়ার মতো সহস্রখণ্ডিত, সেই সময় তারা শুনেছিল লক্ষ্মীবাজারের পলেস্তারা-খসা বাড়িগুলোর ছাদ ছুঁয়ে আজানের ধ্বনি গড়িয়ে যেতে। এবং তারা যখন জানতে পারে যে খাজা আহমেদ আলী ছিল সেই ঝঞ্ঝাকালের মুয়াজ্জিন, তারা সকলেই বলে যে, তারা যখন আজান শুনেছিল তারা তার কণ্ঠ চিনতে পেরেছিল। তারা

সকলেই বলে যে, এমন মধুর স্বরে আজান দেয়া তারা ইতিপূর্বে কখনো শোনে নাই এবং তারা মনে করেছিল, বেলালের কণ্ঠই কেবল এমন হতে পারে। তারা এ-ও বলে যে, তিনি আজান দেয়া সমাপ্ত করেছিলেন এবং আজানের শেষ স্তবকে দুবারের জায়গায় তিনি চারবার 'আল্লাহু আকবর' বলেছিলেন। কিন্তু হমল্লার লোকেরা যখন খাজা আহমেদ আলীর ছাদে গিয়ে তার মৃতদেহ উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখে এবং জানতে পারে যে, আজানের মাঝখানে তাকে গুলি করা হয়, তারা তা মেনে নিতে পারে না। তারা বলে যে, তিনি আজানের শেষে চারবার মহল্লার সকলকে বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ। তারা বিভ্রান্ত বোধ করে এবং তাদের এই বিভ্রান্তি আজীবন থেকে যায়। তারা খাজা আহমেদ আলীর লাশ চিৎ করে দেখে তার মুখের শুভ্র দাড়িতে রক্তের বুদ্বুদ লেগে আছে। তখন তারা তার লাশ নামিয়ে এনে উঠোনে খাজা শফিকের লাশের পাশে রাখে। সেদিন মহল্লার রাস্তা আর বাড়ি থেকে তারা মোট সাতটি লাশ সংগ্রহ করে। মৃত ব্যক্তিদের সকলে ছিল পুরুষ এবং এদের ভেতর সবচাইতে কম বয়স্ক বালকটির বয়স ছিল তেরো বৎসর এবং সবচাইতে বৃদ্ধের আশি। এদের ভেতর দুজন ছাড়া অন্য সকলকে তারা মাটির ওপর থেকে কুড়িয়ে আনে, যেন তারা ঝড়ে উৎপাটিত সেইসব বৃক্ষ সরিয়ে আনে, যেগুলো শাখা পল্লব বিস্তার করে আঙিনায় খাড়া ছিল। অন্য দুজনের একজন, খাজা আহমেদ আলীকে পাওয়া যায় অন্তরীক্ষে আর চৌষট্টি নম্বর বাড়ির আলতাফ হোসেনকে কুয়োর পানিতে। আলতাফ হোসেন গুলি খেয়ে পানিতে পড়েছিল, না পানিতে পড়ার পর গুলি খায়– তা মহল্লার লোক প্রথমে বুঝতে পারে না। দড়ি আর হুক নামিয়ে লাশ টেনে তোলার পর গুলির ক্ষত খুঁজতে গিয়ে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তারা কোনো গুলির ক্ষতের চিহ্ন দেখে না এবং তাদের মনে হয় যে, সে হয়তো পানিতে ডুবে মরেছে। কিন্তু পরে মহল্লার লোকেরা বলে যে, তখন তারা কুয়োর পানির দিকে খেয়াল করে দেখে যে পানি রক্তের মতো লাল হয়ে আছে এবং তখন তারা আবার সর্বত্র অনুসন্ধান করে আলতাফ হোসেনের মাথার চাঁদিতে চুলের ভেতর সরু ক্ষতটা আবিষ্কার করে। কিন্তু তারা গুলির নির্গমন পথ দেখে না; তারা নিশ্চিত হয় যে, যে গুলিতে আলতাফ হোসেন তার প্রাণ হারিয়েছে সেই গুলিটিকে তার দেহ বেরুতে দেয় নাই। এতে মৃত আলতাফ হোসেনের কি লাভ হয়েছিল সে কথা মহল্লার লোকেরা বলে না, তারা শুধু বলে, গুলি ঢুকছে, কিন্তু বাইরয়া পারেনিকা। এবং চাঁদির মধ্যখানে গুলির ক্ষত দেখে তারা নিশ্চিত হয় যে, কুয়োর পানিতে পড়ে যাওয়ার পর তাকে গুলি করে মারা হয়। মহল্লার লোকেরা সবগুলো মৃতদেহ খাজা আহমেদ আলীর বাড়ির উঠোনে এনে জড়ো করে এবং কারফ্যুর ভেতর কোথাও যেতে না পেরে লাশ নিয়ে বসে থাকে। সাতটি লাশ নিয়ে তাদের বিহ্বলতা হয়, শোকের উচ্ছ্বাস হয় না। সেদিন সাতটি লাশ নিয়ে লক্ষ্মীবাজারের জনতা নির্বাক হয়ে বসে ছিল; লক্ষ্মীবাজারের রাস্তা মৃতের মতো নিঃশব্দ ছিল, রাস্তায় একটি কুকুর ছিল না, আকাশে একটি পেঁচা উড়ে আসে নাই বাতাসে ডানার শব্দ কের। তাদের মনে হয়েছিল, তারা সৃষ্টির আদি থেকে কোনো শব্দ শোনে নাই। কিন্তু তারপর, রাত ক্রমাগত বাড়তে থাকলে তারা বুঝতে পারে, একটি নারীর কান্নার শব্দ তারা শুনতে পাচ্ছে। অনেকটা বিস্মৃতির তল থেকে যেন তারা মানুষের এই ধ্বনিগত আচরণের বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং দেখে যে, তারা নিজেরা কেউ কাঁদে না। তারা বরং কান পেতে অচেনা রমণীর কান্নার শব্দ শোনে, আস্তে আস্তে তাদের এমন হতে থাকে যে, কান্নার এই শব্দ এমনকি মিলিটারি চলে যাওয়ার আগেই তারা

পেয়েছিল। মহল্লার লোকেরা তখন নিশ্চিত হয় যে, আরো একটি লাশ কোথাও রয়ে গেছে, কোনো বাড়িতে, যাদের সঙ্গে যেভাবেই হোক, অন্যান্যদের যোগাযোগ ঘটে নাই। তারা তখন তাদের অসাড় হয়ে আসা ইন্দ্রিয় সজাগ করে শোনে এবং বুঝতে পারে যে, কান্নার শব্দ বদু মওলানার বাড়ির দিক থেকে ভেসে আসে। বদু মওলানার বাড়িতেই কেউ দীর্ঘক্ষণ ধরে কাঁদছে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হলে মহল্লার মানুষের প্রথমে অবিশ্বাস হয়, তারপর তারা তাদের শোকের ভেতরে উল্লসিত হতে থাকে। কারণ, মহল্লার লোকেরা বদু মওলানাকে সেদিন একটু আগে দেখেছে একা, পৃথক পরিচয়ে। একদল খাকি পোশাক পরা লোকের সঙ্গে ধূসর রঙের পপলিনের জোব্বায় আবৃত বদু মওলানা লক্ষ্মীবাজারের রাস্তায়, ঘরে, আঙিনায়, কুয়োতলায়, বাড়ির ছাদে শিকারোৎসব করেছিল। এখন এই কান্নার শব্দে মহল্লার লোকদের ক্ষোভ এবং উল্লাস একত্রিত হয়ে তাদেরকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে যায়, যখন তাদের মনে হয় যে, বদু মওলানার রক্তের রমণীকে কাঁদতে না দেখলে তাদের এই শোকের শেষ হবে না, তাদের এই উল্লাস পূর্ণ হবে না। তখন মহল্লার লোকেরা বদু মওলানার বাসায় যায় এবং গিয়ে তারা ভুল বুঝতে পারে। তারা জানতে পারে যে, প্রথমত যে কাঁদছিল, সে কোনো নারী নয়, সে বদু মওলানার ছোট ছেলে আবুল বাশার। আবুল বাশার কাঁদছিল কারণ, পাকিস্তানি মিলিটারি আবুল বাশারের প্রিয় কুকুর ভুলুকে গুলি করে মারে। মহল্লার লোকেরা বদু মওলানার উঠোনে ইলেকট্রিকের আলোয় লালচে খয়েরি রঙের ভুলুকে ঘিরে বসে থাকা বাড়ির চাকরদের দেখে। তারা জানতে পারে যে, ভুলুকে যে কারণেই হোক মেরে ফেলার পর আবুল বাশার কাঁদতে থাকলে বদু মওলানা তার মুখ চেপে ধরেছিল আর তখন মিলিটারিদের নেতা পাঞ্জাবি ক্যাপ্টেন, বদু মওলানাকে বলেছিল ছেলেকে ছেড়ে দিতে। বলেছিল, উনকো রোনেদো। লক্ষ্মীবাজারের লোকেরা যখন বাড়ির ভেতর লাশ রেখে নিস্তব্ধতার আড়ালে লুকিয়ে ছিল, ঠিক তখন পাকিস্তানি মিলিটারি বদু মওলানাকে এই বিশেষ মর্যাদা দেয়। তার ছেলে নিহত প্রিয় কুকুরের জন্য শোক প্রকাশের সুযোগ পায় এবং মিলিটারি মহল্লা ছেড়ে চলে যাওয়ার আগেই সে কান্না শুরু করে। আর মহল্লার লোকেরা নিহতের শোক নিয়ে পুরো রাত অপেক্ষা করে, পুরোটা বছর অপেক্ষা করে; সেই সময় পর্যন্ত, যখন হেমন্তের এক বৃহস্পতিবার স্টেনগান হাতে, জলপাই রঙের পোশাক আর মুখ ভর্তি লম্বা দাড়ি নিয়ে একদল মুক্তিযোদ্ধা মহল্লায় এসে দাঁড়ায়। তারা বলে, আর ভয় নাই, শালারা খতম। মহল্লার লোকেরা রাস্তায় নেমে এসে জংলি চেহারার লোকগুলোর কাঁধে চাপড় দিতে থাকে। তখন গাঢ় সবুজ রঙের ভেতর লাল সূর্য এবং সোনালি মানচিত্র আঁকা একটি পতাকা নিয়ে আবুল কাশেমের ছেলে জসিম দৌড়ে এসে চিৎকার করে ওঠে, জয় বাংলা, আর তখন মুক্তিযোদ্ধা দেখতে এসে আলাউদ্দিনের মা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কেঁদে ওঠে, অরা আমার আলাউদ্দিনরে মাইরা ফালাইছে। মুক্তিযোদ্ধা ছেলেগুলো ধুলোয় লুটানো এই নারীকে টেনে তোলে না, কোনো সান্ত্বনা দেয় না, তারা তাকিয়ে দেখে না পর্যন্ত; তারা শুধু এই শোকার্ত নারীকে ঘিরে রাখে। তাদের সকলের পিঠে ঝোলানো আগ্নেয়াস্ত্র এবং কোমরের বেল্টে বাঁধা গুলির বাক্স। তারা নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, রোগা এবং নোংরা আঙুল দিয়ে লম্বা চুলের জট ছাড়ায়, সিগারেট ঠোঁকে। এদের বৃত্তের ভেতর আলাউদ্দিনের মা মাটির ওপর পড়ে থেকে কেঁদে নেয়। মহল্লায় মুক্তিযোদ্ধার আগমনের খবরে অন্যান্যের ভেতর তিনজন নারীর বিশেষ ঔৎসুক্য হয়, তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে জনতার সঙ্গে অপরিমিত চুল দাড়ি গজানো এবং নোংরা পোশাক পরা ছেলেগুলোকে দেখে।

তারপর, তারা যখন এগিয়ে এসে এই নিরাসক্ত তরুণদের কাছে নিজেদের পুত্রদের পরিচয় প্রকাশ করে এবং তাদের সম্পর্কে জানতে চায়, তখন দাড়িওয়ালা এই জংলি তরুণরা তাদেরকে ঘিরে ধরে এবং পিতা যেমন কন্যাকে বাহুর ভেতর নেয়, সেভাবে তাদের কাঁধের ওপর হাত রেখে বলে যে, তাদের ছেলেরা ফিরবে নিশ্চয়ই। কিন্তু তাদের এই কথা সর্বাংশে সত্য প্রমাণিত হয় না; বাবুল এবং আলমগীর ফিরে আসে কিন্তু মোহাম্মদ সেলিম ফিরে আসে না। তার মায়ের সব প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়, তার ছেলেটি মুক্তিযুদ্ধ শেষে আর ফেরে না। সে বুঝতে পারে সে আর ফিরবে না, তবু তার মন পুরনো প্রতীক্ষায় জেগে থাকে। মহল্লার লোকরা বলে যে, মোহাম্মদ সেলিমের জন্য তার মা প্রতীক্ষা করে আছে, আর আছে মায়ারাণী মালাকার। কিন্তু আবদুল মজিদ জানে যে, মায়ারাণী মোহাম্মদ সেলিমের জন্য প্রতীক্ষা করে না, সে অবশ্য জানে না মায়ারাণী তবে কার প্রতীক্ষা করে এবং কেন ক্রমাগতভাবে কুমারী থেকে যায়। আবদুল মজিদ নিশ্চিতভাবেই জানে, যুদ্ধের পর মোহাম্মদ সেলিমের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা যখন শেষ হয়ে যায় তখন তার বাক্স ভেঙে মায়ারাণীর লেখা যে একটিমাত্র চিরকুট পাওয়া যায়, সেটা মায়ারাণী লেখে নাই। একমাত্র আবদুল মজিদ এই দুর্ভাগ্যজনক তথ্যটি জানে যে, মোহাম্মদ সেলিমের একুশটি প্রেমপত্রের উত্তরে এক লাইনের যে পত্রটি তার হস্তগত হয়েছিল সেটা আসলে মায়ারাণীর লেখা ছিল না। আবদুল মজিদ পারিবারিক ঝামেলায় নিমজ্জিত হয়ে না থাকলে শোনে, শনিবার সন্ধ্যেয় মায়ারাণী শনিপুজো করে। তার বিষণ্ন কণ্ঠ পাশের বাড়ি থেকে দেয়ালের ওপর দিয়ে এমন এক বাউলসঙ্গীতের মতো ভেসে আসে, যার অর্থ সে বোঝে না। শনিবারের সন্ধ্যেয় মায়ারাণী বিষণ্ন স্তোত্রের মতো উচ্চারণ করে– আসেন শনি বসেন খাটে, পস্‌সাদ দেব হাতে হাতে। আবদুল মজিদ বুঝতে পারে না মায়ারাণী কেন শনিকে ডাকে, তবে তার মনে হয় এই অনন্ত আহ্বানে তার কোনো আনন্দ নেই, তার কণ্ঠে শুধু বিষণ্নতা। আবদুল মজিদের মনে পড়ে, মায়ারাণীর মায়ের কণ্ঠে এমন বিষণ্নতার ঘোর ছিল না। সে সময়, সে যখন হাফপ্যান্ট পরত, তখন শনিবার সন্ধ্যেয় সে দু'বাড়ির মাঝখানের দেয়ালের ওপর চড়ে বসে থাকত। তখন মায়ারাণীর মা আসত মাথায় ঘোমটা টেনে, কপালে থাকত পূর্ণিমার চাঁদের মতো বড় এবং গোল সিঁদুরের টিপ। মায়ারাণীর মা কাঁসার থালার ওপর সরষের তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে ফটকের কাছে তুলসী গাছের কাছে এসে বসত এবং একইভাবে শনিকে ডাকত। তুলসী গাছের গোড়ায় বাঁধানো নিচু বেদির ওপর রাখা প্রদীপ জ্বলত, আবদুল মজিদ শুনত মায়ারাণীর মার শনি-আবাহন– আসেন শনি বসেন খাটে, পস্‌সাদ দেব হাতে হাতে। এভাবে পুজো হয়ে গেলে, মায়ারাণী হাতে করে একটি বড় বাটি নিয়ে আসত এবং প্রাঙ্গণে অপেক্ষমাণ বালক-বালিকা ও দেয়ালের ওপর বসে থাকা আবদুল মজিদের প্রসারিত করতলের ওপর কলা ও দুধ মাখানো ভিজে চিড়ার একটি করে মণ্ড অর্পণ করত। আবদুল মজিদের এখন কখনো কখনো মনে হয়, হাত পাতলে একইভাবে তার হাতে প্রসাদ তুলে দেবে কালো এবং বোকাটে চেহারার মায়ারাণী। মোহাম্মদ সেলিম কেন এই কালো মেয়েটিকে দেখে বিমোহিত হয়েছিল তা আবদুল মজিদ বুঝতে পারে না, তবে তার মনে হয়, মোহাম্মদ সেলিমের যে রকম প্রাণপ্রাচুর্য ছিল তাতে তার পক্ষে কালো মায়ারাণীর প্রেমে পড়া এবং সেই প্রেম ত্যাগ করে যুদ্ধে যাওয়া সম্ভব ছিল। মায়ারাণী তখন বাংলাবাজার স্কুলে দুবার ফেল করার পর তৃতীয়বার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, সেই সময় মোহাম্মদ সেলিম পুষ্পশরে বিদ্ধ হয়ে

বেপথু হয়ে পড়ে। মহল্লার লোকেরা কয়েক দিন মোহাম্মদ সেলিমের অস্বাভাবিক ব্যবহার অবলোকন করেছিল, তারা খেয়াল করেছিল মোহাম্মদ সেলিম, মায়ারাণী রাস্তায় বের হলে তার পিছনে ধীরগতিতে এলেবেলেভাবে সাইকেল চালাতে থাকে অথবা রাস্তার মোড়ে চুলে টেরি কেটে দাঁড়িয়ে থাকে হাঁ-করে। তারা এ-ও খেয়াল করেছিল যে, মোহাম্মদ সেলিমের এই উত্তেজনার প্রতি মায়ারাণীর লক্ষ ছিল না, সে বুকের ওপর বই চেপে ধরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে হেঁটে যেত। মোহাম্মদ সেলিমের প্রণয় উত্তেজনায় মহল্লার লোকেরা বিরক্ত হয়ে ওঠার আগেই তারা লক্ষ করে যে, তার উত্তেজনা নেমে গেছে। আসলে তখন মোহাম্মদ সেলিম এই সত্যটি আবিষ্কার করে যে, আবদুল মজিদ প্রতি শনিবারে মায়ারাণীর নিজ হাতে তুলে দেয়া দুধ-কলার প্রসাদ খায় এবং সে মায়ারাণীকে প্রেম নিবেদনের পন্থা বদলে ফেলে। তখন তার তৎপরতা লোকচক্ষুর অন্তরাল হয়ে যায়। সে আবদুল মজিদকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার পিতার কনফেকশনারি দোকানের বয়াম খুলে তার হাত ভরে লাড্ডু বিস্কুট দেয় এবং বলে, ল, খা। আবদুল মজিদের এখন মনে হয়, সে নির্বোধের মতো লাড্ডু বিস্কুট খেয়েছিল, কারণ তার পরদিনই মোহাম্মদ সেলিম তাকে একটি চিঠি দেয় মায়ারাণীকে পৌঁছে দেয়ার জন্য। আবদুল মজিদ এবারও নির্বোধের মতো সেটা নিয়ে যায় মায়ারাণীর কাছে এবং মায়ারাণী তাদের শেফালি ফুলগাছ তলায় দাঁড়িয়ে সেটা নিতে অস্বীকার করলে আবদুল মজিদ চিঠিটা এনে তাদের ঘরের ভেতর ইট খসানো একটি ফোকরের ভেতর রেখে দেয়। এভাবে, মোহাম্মদ সেলিমের ইন্টারমিডিয়েট ফাইনাল পরীক্ষার আগে যখন যুদ্ধ লেগে যায় এবং সে মায়ারাণীকে রেখে যুদ্ধে চলে যায়, তখন পর্যন্ত আবদুল মজিদদের বাড়ির দেয়ালের ফোকরে একুশটি চিঠি জমা হয়। আবদুল মজিদের পরবর্তী সময়ে মনে হতো যে, মোহাম্মদ সেলিমের ভালোবাসা পাওয়া উচিত ছিল, মায়ারাণীর উচিত ছিল এটুকু তাকে দেয়া; কারণ সে তো ছিল তাদেরই একজনের মতো, যারা একদিন শরীরে যুদ্ধের ক্লান্তি এবং বারুদের গন্ধ নিয়ে এসে মহল্লায় দাঁড়িয়েছিল আর তখন আলাউদ্দিনের মা এতদিন পর ধুলোয় বিছিয়ে পড়ে কান্নার উৎসব করেছিল। আর যেদিন খাজা আহমেদ আলীর উঠোনে পুরনো মাদুর এবং চাটাইয়ের ওপর আলাউদ্দিনের লাশ অন্য ছটি লাশের সঙ্গে রাখা ছিল সেদিন তার মা চুপ করে বসে ছিল, ভীত মূঢ় জন্তুর মতো। সেদিন মহল্লায় শুধু আবুল বাশার কেঁদেছিল। সেই কান্নার শব্দ একবার শোনার পর মহল্লার লোকদের মনে হয়েছিল যেন সে রাতে আবুল বাশারের কান্না সকাল পর্যন্ত শোনা গিয়েছিল। এই বালকটি যে বদু মওলানার খুব প্রিয় সন্তান ছিল, মহল্লার সকলে তা জানত। এই কারণেই হারাম জীবপোষায় ছেলের ইচ্ছেয় সে সম্মত হয়েছিল এবং ফলে এই কুকুরের জন্য শোক করার অনুমতি দেয়ায় তার হৃদয় আপ্লুত হয়, পুত্র, পুত্রের কুকুর এবং সেই পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের জন্য। কিন্তু একাত্তর সনের উত্থান-পতনের কারণে বদু মওলানা কালক্রমে তার এই ছেলেটিকে হারায়; তার আর কোনো বড় ক্ষতি হয় না। এই একটি মৃত্যু ছাড়া সে তার পরিবারকে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া-বিষয়ক তার যে দুর্যোগ হয় সেই অবস্থার ভেতর দিয়ে পার করে নিয়ে আসে এবং আশি সনে একই দলের বড় নেতা হয়। আবদুল মজিদ এখন দেখে আজিজ পাঠানদের সঙ্গে বদু মওলানার দল একসঙ্গে সরকারবিরোধী আন্দোলন করে। আবদুল মজিদ শোনে মহল্লার মানুষকে বদু মওলানা এবং তার ছেলেরা 'ভাইসব' বলে সম্বোধন করে সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য ডাক দেয়। শুনে আবদুল মজিদের স্যান্ডেলের ফিতে ফট্ করে ছিঁড়ে যায়; সে দেখে, বদু মওলানার ছেলের

আলখাল্লার ভেতর থেকে কাক ওড়ে। সে ঘরে ফিরে এসে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, সে তার মৃত বোনের কথা ভুলে যেতে পারে না; তার ঘাড়ের পাশে বেয়োনেটের ক্ষত ছিল, বুকের নিচ থেকে ছিন্নভিন্ন ছিল এবং দেশ যখন মুক্তি প্রক্রিয়ার শেষ সীমানার নিকটে পৌঁছেছিল তখন সে রায়েরবাজারে একটি মাঠের ওপর আকাশের দিকে স্থির চোখ রেখে পড়ে ছিল। আবদুল মজিদ বদু মওলানার সেই সব দিনের কথা ভুলতে পারে না, কারণ সে মোমেনার কথা ভুলতে পারে না। সে নবাবপুর রোডের ওপর মাইকে বদু মওলানার ছেলের দেয়া ধন্যবাদের মুখোমুখি হয়ে ঘরে ফিরে ইয়াসমিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং তখন মহল্লার ভেতর আবার মাইকের শব্দ বিকশিত হয়। এই লোকটিও তাদেরকে 'ভাইসব' বলে সম্বোধন করে হরতাল সফল করার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করে। 'জয় বাংলা' বলে সে এই বিবৃতি শেষ করে, তারপর আবার 'ভাইসব' বলে শুরু করে। মহল্লার লোকেরা বিভ্রান্ত বোধ করে। তাদের এই কথাটি হয়তো অকারণেই মনে পড়ে যে, যেদিন বদু মওলানা তার কালো চেকের স্কার্ফটা কাঁধে ফেলে এগিয়ে এসে পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের সম্মুখে দাঁড়ায়, সেদিন মহল্লায় আজিজ পাঠান অনুপস্থিত ছিল। আবার সে বছরের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে সে যখন মহললায় সপরিবারে প্রত্যাবর্তন করে তখন মহল্লায় বদু মওলানা ছিল না। মহল্লার লোকদের মনে পড়ে, মহল্লায় যেদিন প্রথম মিলিটারি আসে, বদু মওলানা তাদেরকে আজিজ পাঠানের বাড়িতে নিয়ে যায়। মিলিটারি আজিজ পাঠানের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। তার বাড়ির গেটে নৌকো দিয়ে তৈরি তোরণে একজন মিলিটারি 'শালা' বলে গাল দিয়ে একঝাঁক গুলি করে, তারপর বাড়ির সঙ্গে সেটা ভস্মীভূত হয়। আজিজ পাঠান কবে মহল্লা ত্যাগ করে তা লোকেরা মনে করতে পারে না, তাদের শুধু মনে পড়ে, মার্চের পঁচিশ তারিখের পর একদিন বদু মওলানা একদল লোক নিয়ে আসে। তারা মহল্লার হিন্দুদের বাসার তালা ভেঙে লুট করে। তারা আজিজ পাঠানের বাসার তালা ভেঙে সব জিনিসপত্র বদু মওলানার বাসায় নিয়ে জড়ো করে। তারা শাবল দিয়ে এই লুণ্ঠিত বাড়িগুলোর পুরনো দরজা আর জানালা চৌকাঠসহ খুলে নেয়। তারপর মিলিটারি যে দিন আজিজ পাঠানের বাড়িতে আগুন দেয় তখন সেটা পুড়তে চায় না; শুধু গুলি খাওয়া, গলুই ভাঙা নৌকোটা দাউদাউ করে জ্বলে। মহল্লার লোকেরা এই বিষয়ে অবগত ছিল যে, বদু মওলানা আজিজ পাঠানের সব অস্থাবর সম্পত্তি নিজের বানিয়ে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ঘটনা এমন আকার নিয়ে ঘটে, যাতে করে মহল্লার লোকদের মনে হয় যেন বদু মওলানা, আজিজ পাঠানের সম্পত্তির জিম্মেদারি গ্রহণ করেছিল মাত্র। একাত্তর সনের শেষ বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বরের ত্রিশ তারিখে আজিজ পাঠান ফিরে এলে মহল্লার মানুষ উল্লসিত হয়ে পড়ে। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত দীর্ঘদেহী আজিজ পাঠান নিজের বাড়িতে প্রবেশের পূর্বে লক্ষ্মীবাজারের রাস্তা দিয়ে বিজয়ী সেনাপতির মতো পা টেনে টেনে হেঁটে যায়। তাকে দেখে পুত্র এবং স্বামীহারা নারীরাও হর্ষধ্বনি করে। আজিজ পাঠান মহল্লার প্রতিটি বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়ায়, প্রতিটি লোকের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়, তারপর খাজা আহমেদ আলী এবং তার ছেলের কবর জিয়ারত করে নিজের বাসায় যায়। তার দরজা-জানালার চৌকাঠ ওড়ানো দগ্ধ বাসা কঙ্কালের করোটির মতো দেখায়। সে তার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে একবার মুখ তুলে বিধ্বস্ত বাড়ির দিকে দেখে, তারপর ঘুরে দাঁড়ায় রাস্তায় তাকে অনুসরণ করে আসা এবং নীরবে অপেক্ষমাণ জনতার দিকে। তার চেহারায় জনতা দুঃখ কিংবা বিষাদ লক্ষ করে না। সে তার হাত তখন জনতার

দিকে বাতাসে উড়তে থাকা পতাকার মতো প্রসারিত করে দিলে তারা ঢেউয়ের মতো উদ্বেলিত হয়ে উঠতে চায়। তখন সে স্মিত মুখে বলে, আমাগো অনেক কিছু দেওন লাগচে, তবু আমরা স্বাধীন হইচি। আজিজ পাঠান তার বাসায় প্রবেশ করার পর মহল্লার লোকেরা বদু মওলানার বাড়ির দরজা ভেঙে সব জিনিসপত্র এনে আজিজ পাঠানের উঠোনে স্তূপ করে রাখে। এইসব জিনিসপত্র পরীক্ষা করে আজিজ পাঠানের স্ত্রী বলে যে, এ সবই তাদের, শুধু দুটো বস্ত্রখণ্ড ছাড়া। একথা শুনে মহল্লার লোকেরা সন্তুষ্ট হয় এবং কিছুক্ষণ পর যে যার বাড়িতে ফিরে যায়। এই সময় কয়েকদিন পর বদু মওলানা লুণ্ঠিত পরিত্যক্ত বসতবাড়ি এবং আজিজ পাঠানের বাসার সামনে পুনরায় নির্মীয়মাণ এক কাঠের নৌকা দেখে কিশোর আবদুল মজিদের বুকের ভেতরের সেই সংকটের টানাপোড়েন অবচেতনভাবেই নেমে যায়, যার সূচনা হয়েছিল বদু মওলানা মোমেনাকে গাল দেয়ার পর। সে ঘরে ফিরে তার মাকে খবরটা দিয়ে আশ্বস্ত করে, আজিজ পাঠানের বাসার গেটে এউকগা নতুন নাও বানাইবার লাগছে। কিন্তু বাহাত্তর সনের গোড়ায় মহল্লার লোকেরা এবং আবদুল মজিদ বুঝতে পারে নাই যে, বিষয়টির নিষ্পত্তি তখনো হয় না এবং তারা আরো অনেক কিছু দেখবে। তারা জানে নাই যে, আজিজ পাঠানের বাড়ির ফটকে নির্মিত নৌকোটি জীর্ণ হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার আগেই, দুবছরের ভেতর বদু মওলানা মহল্লায় ফিরে আসবে এবং লক্ষ্মীবাজারের রাস্তা দিয়ে প্রথমে ছায়ার মতো হেঁটে যাবে তারপর আশি সনে আবদুল মজিদসহ তারা কেউ কেউ একদিন বদু মওলানাকে দেখবে তার ভারপ্রাপ্ত আমিরকে সংবর্ধনা প্রদান করতে। আবদুল মজিদ কলতাবাজারের মোড়ের পানির ট্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে বদু মওলানার বক্তৃতা শুনবে। এই বক্তৃতা থেকে মহল্লার লোকেরা সেদিন জানতে পারবে, স্বাধীনতার পর পলাতক অবস্থায় কিভাবে বদু মওলানার আদরের ছেলে মারা যায়। এখন মহল্লার লোকদের মনে পড়ে সেদিন বক্তৃতার সময় বদু মওলানা আকাশের দিকে দুহাত উঁচু করে ধরে বলেছিল যে, সেটা ছিল এক পরীক্ষা। আল্লাহ যেমন হযরত ইব্রাহীমকে প্রিয় পুত্র কোরবানি করতে বলে পরীক্ষা করেছিলেন, তেমনি তারও জীবনে পরীক্ষা আসে এবং সে তখন তার প্রিয়তম পুত্রকে হারায়। তিয়াত্তর সনে বদু মওলানা মহল্লায় ফিরে আসার পর মহল্লার লোকেরা জানতে পারে আবুল বাশারের মৃত্যু হয়েছে এবং যদিও এই মৃত্যুর কারণ তারা আশি সনে দেয়া বদু মওলানার বক্তৃতার আগে জানতে পারে না, তারা মনে করে, এটা এক রকমের প্রতিশোধ। পরে বদু মওলানা হযরত ইব্রাহীম এবং তার পরীক্ষার বিষয়ে যেদিন বর্ণনা করে, মহল্লার লোকেরা যারা তখন তার বক্তৃতা শুনছিল, জানতে পারে যে, আবুল বাশার খেপুপাড়ার এক গাঁয়ে লুকিয়ে থাকার সময় পুকুরের পানিতে ডুবে মারা গিয়েছিল। মহল্লার লোকেরা একটি ব্যাপারে একমত ছিল যে, আবুল বাশার, বদু মওলানার যথার্থই প্রিয় ছিল। এ ব্যাপারে মহল্লাবাসীর একটি তত্ত্ব ছিল এই যে, এই বালকটির এক ধরনের পঙ্গুত্ব ছিল এবং তাই তার পিতার বিশেষ দুর্বলতা ছিল তার প্রতি। আবুল বাশারের পঙ্গুত্বের ব্যাপারে মহল্লার লোকদের এই সন্দেহ পরবর্তী সময়ে সঠিক প্রমাণিত হলেও প্রথমে তারা নিশ্চিত ছিল না। তারা বলেছিল যে, আবুল বাশার বালক অথবা বালিকা কোনোটিই নয়। এই ধারণার সূত্রপাত কিভাবে হয়েছিল তা কেউ বলতে পারে না, তবে কথাটি ছড়িয়ে গেলে তারা সন্দেহ করতে থাকে কিন্তু নিশ্চিত হতে পারে না। বদু মওলানা তার এই ছেলেটিকে জন্মের পর থেকেই ডেমরায় তার শ্বশুর বাড়িতে রেখে দেয় এবং মহল্লায় যখন সে প্রথম আসে তখন সে ছবছরের বালক এবং মহল্লার লোকেরা দেখে

যে, তাকে সব সময় কাপচোপড় পরিয়ে রাখা হয়। বিষয়টি মহল্লার লোকের জন্য কোনোভাবেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না, কিন্তু তাহলেও ব্যাপারটি সম্পর্কে তারা নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যখন ডিসেম্বরের একুশ তারিখে জিঞ্জিরায় রাজাকার আবদুল গণি ধরা পড়ে। আবদুল গণিকে সেদিনই দুপুরে লক্ষ্মীবাজারে নিয়ে আসে দুজন মুক্তিযোদ্ধা এবং তার নিকট থেকে লোকেরা জানতে পারে এতদিন দেশে এবং মহল্লায় যা কিছু ঘটেছে তা কেমন করে ঘটেছে। প্রথমত, নয় মাসে মহল্লায় নিহত ব্যক্তিদের ছাড়া আটজন নিখোঁজ লোকের তালিকা ছিল মহল্লার লোকদের কাছে। এর ভেতর তিনজন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে গৃহত্যাগ করেছিল বলে পরে জানা গিয়েছিল, অন্য পাঁচজন সম্পর্কে তাদের জানার প্রয়োজন ছিল। দুপুরের একটু আগ দিয়ে আবদুল গণিকে এনে সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুলের ভেতরের প্রাঙ্গণে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। এ অবস্থায় সে কিছু বলতে অস্বীকার করে, তার চেহারা এবং চাহনি দেখে জনতার কোণঠাসা শৃগালের কথা মনে পড়ে। তখন তাকে ভিক্টোরিয়া পার্কের চত্বরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তাকে একটি পাকা বেঞ্চের ওপর উপুড় করে শুইয়ে দেয়া হয়। তাকে এমনভাবে শোয়ানো হয় যেন তার মাথাটা বেঞ্চের বাইরে থাকে। তারপর তাকে দড়ি দিয়ে বেঞ্চের সঙ্গে পেঁচিয়ে বেঁধে তার মুখের নিচে পেতে দেয়া হয় একটি নিচু টেবিল এবং টেবিলের ওপর বসানো হয় একটি মাইক্রোফোন, রাখা হয় তিনটি দীর্ঘ নামের তালিকা, আর মুখের নাগালের ভেতর স্ট্র-সহ একটি ভিটাকোলার বোতল। তারপর একজন মুক্তিযোদ্ধার এসএলআরের নল তার লুঙ্গি উঁচু করে ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়। তখন চারদিক থেকে লোক এসে শহীদ সিপাইদের স্মৃতিস্তম্ভের সিঁড়ি এবং বেদির ওপর এবং নিচে সবুজ ঘাসের চত্বরে জমা হয়। তারা বুঝতে পারে না এসএলআরের নলটি রাজাকার আবদুল গণির পাছার ছিদ্রের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছে কি না। তাদের একদলের মনে হয় নলটা প্রবিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু অন্যদল নিশ্চিত হয় যে, নলটি ঢোকানো হয় নাই; কারণ আবদুল গণি যখন নড়ছিল তখন লুঙ্গির তল থেকে বেরিয়ে থাকা অস্ত্রটি নড়ছিল। তারা বলে যে, নলের মুখটি কেবলমাত্র উরুসন্ধিতে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল। তবে এই সময় তাদের তর্ক থেকে যায়, কারণ মাইকে আবদুল গণির কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। তিনটি তালিকা শেষ করতে আবদুল গণির দুঘণ্টার বেশি লেগে যায়। তালিকার নাম পড়ে সে কতগুলোকে শনাক্ত করে, কতগুলোকে শনাক্ত করতে পারে না। মাইকে যখন তার কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে থাকে, তাকে ঘিরে দাঁড়ানো জনতা এক অস্বাভাবিক নীরবতায় প্রস্তরীভূত হয়ে থেকে শোনে সেই দিনগুলোর কথা, যার ভেতর দিয়ে তারা পার হয়ে এসেছিল এক দুঃস্বপ্নের মতো এবং এখন তাদের মনে হচ্ছিল যেন তারা সবকিছুই নতুন শুনছে অথবা তারা কোনো কিছুই আগে জানে নাই। আবদুল গণি যখন একটি নাম শনাক্ত করছিল এবং বর্ণনা করছিল তার অন্তিম পরিণতির কথা, তখন জনতার ভেতর থেকে বিলাপ করে উঠছিল একটি পুরুষ, স্ত্রীলোক অথবা এমন কেউ নিখোঁজ ব্যক্তিটি ছিল যার স্বামী, সন্তান, বন্ধু অথবা প্রতিবেশী। আবদুল গণি যখন কথা বলা শেষ করে তখন ভিক্টোরিয়া পার্কের চত্বরে একুশ জন পূর্ণবয়স্কা নারী মাটি চাপড়ে বিলাপ করে, দশ জন পুরুষ এবং বালক ফোঁপায় আর গোটা জনতা উদ্বেলিত হয়ে পড়ে। আবদুল গণির কাছ থেকে লক্ষ্মীবাজারের লোকেরা জানতে পারে, আবু করিমের বড় ছেলেকে বাড়ি ফেরার সময় কলতাবাজার খাদ্য-গুদামের সামনে থেকে সন্ধ্যের পর ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে তারা রাতে জবাই করে। তার কাছ থেকে লক্ষ্মীবাজারের লোকেরা

মালিটোলার ইসমাইল হাজামের নিহত হওয়ার কথা শোনে। লক্ষ্মীবাজারের নিখোঁজদের তালিকায় ইসমাইল হাজামের নাম না থাকলেও তখন তাদের তার নাম মনে পড়ে। বদু মওলানার বাড়ির বাইরের আঙিনায় জুন মাসের এক মঙ্গলবারে পাথরের শিলের ওপর পানি ছিটিয়ে সে ঘাড় গুঁজে ক্ষুর ধার দিচ্ছিল মহল্লার লোকের নিস্পৃহ ঘোলা দৃষ্টির সামনে। বদু মওলানার বাড়ি সেদিন রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো হয়েছিল, মহল্লার লোকেরা সেটা দেখে ভেবেছিল, বদু মওলানা নিশ্চয়ই আর-একটি বিয়ে করছে। তাদের এ ভুল অবশ্য ভাঙে, কারণ বদু মওলানা তাদেরকে দাওয়াত করে, আর তারা এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করতে না পেরে যখন বদু মওলানার বাড়ি এসে হাজির হয়, আঙিনার আতা গাছেল সবুজ ছায়ায় ইসমাইল হাজামকে দেখতে পায়। তারা পায়ের গোড়ালির নিচে এক টুকরো কাঠ দিয়ে বসা ইসমাইল হাজামকে একমনে ক্ষুরে শান দিতে এবং ঝকঝকে ক্ষুরের কিনারায় হাতের বুড়ো আঙুল ছুঁয়ে ধার পরীক্ষা করতে দেখে। তারা কেবলমাত্র তখন জানতে পারে যে, বদু মওলানার ছেলে বাশারের খাতনা হবে; কারণ বদু মওলানার চাকর যখন তাদের দাওয়াত করে, সে শুধু বলেছিল, মওলানা সাবে আপনেরে দুপুরে যাইতে কইছে। এখন কথাটা জানতে পেরে মহল্লার লোকেরা হেসে উঠে এবং বদু মওলানার এই ছেলেটির পুরুষাঙ্গের অনুপস্থিতি সংক্রান্ত গুজব-নির্ভর তাদের সন্দেহ দূরীভূত হয়। তারা আঙিনায় ডেকোরেটরের দোকান থেকে আনা ফোল্ডিং চেয়ারে বসে থাকে, বাড়ির চাকর এবং আতাগাছ তলার ইসমাইল হাজাম ছাড়া তাদের সামনে আর কেউ আসে না। ইসমাইল হাজাম যেন অনন্তকাল ধরে ক্ষুরে শান দেয়, কিন্তু তার বুড়ো আঙুলকে তৃপ্ত করার মতো ধার যেন ওঠে না; সে বুড়ো আঙুল বুলিয়ে পুনরায় শিলের ওপর এপিঠ-ওপিঠ করে ক্ষুর ঘষে। ইসমাইল হাজামের ক্ষুর ঘষার শব্দে যখন মহল্লার লোকদের চোখে দুপুরের ঘুম এসে যায় তখন তাদের ক্লান্ত চোখের সামনে দিয়ে আবুল বাশারকে বদু মওলানা নিয়ে আসে। একটি আলপনা আঁকা মাদুরের ওপর তাকে বসিয়ে গোলাপ জল মেশানো পানিতে গোসল করিয়ে যখন ভেতরে নিয়ে যায় তখনো ইসমাইল হাজাম তার ক্ষুরে পরতের পর পরত ধার ওঠাতে থাকে। মহল্লার লোকেরা তার এই একঘেয়ে আচরণে বিরক্ত হতে গিয়েও তার প্রশংসা করে এই বলে যে, সে ক্ষুরে যে ধার চড়িয়েছে, এখন ক্ষুর এবং বালকের শিশ্ন কেউ বুঝে ওঠার আগেই বাড়তি চামড়াটুকু খণ্ডিত হয়ে পড়বে। একটু পর ইসমাইল হাজাম শেষবারের মতো আঙুল বুলিয়ে ক্ষুরটা যত্ন করে খাপের ভেতর রেখে সাদা পরিষ্কার ন্যাকড়া ভাঁজ করে মোটা সলতের মতো বানায়, তারপর সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে একটা কাটা কলাপাতার ওপর রাখে। লোকেরা ইসমাইল হাজামের কাজের কুশলতা দেখে। শিশ্নাগ্র ছেদনের জন্য ক্ষুর এবং ক্ষতে জড়িয়ে দেয়ার জন্য ছাইয়ের পট্টি তৈরি করার পর সে তার সব যন্ত্রপাতি নিয়ে রাবারের জুতোয় ফট্ ফট্ করে বাড়ির ভেতরে যায়। এরপর মহল্লার লোকেরা আর কিছু দেখে না। ভেতরের যে ঘরে খাতনার মূল কাজটি সম্পন্ন হয় সেখানে মহল্লার কেউ ছিল না এবং সে সময় জানালাহীন সেই ঘরের দরজা লাগানো ছিল। এই সময় মহল্লার লোকেরা চলে আসতে পারত, কারণ গরম এবং ক্ষুৎপিপাসায় এমনিতেই তারা কাতর হয়ে পড়েছিল এবং তাদের সামনে তখন শূন্য উঠোন ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু কেন তারা তা না করে অপেক্ষা করে তা তারা বলতে পারে না। আসলে বন্ধ ঘরটির ভেতর তাদের দৃষ্টি না গেলেও তারা সকলেই যেন ব্যাপারটি দেখতে পায়। কারণ তাদের সকলেরই শিশ্নাগ্র ছিন্ন হয়েছিল এভাবে

একদিন। তারা দেখে যে, আবুল বাশারের পরনের কাপড় খুলে নেয়া হয় আর তাতে তাদের চোখের সামনে উন্মোচিত হয় বালকের ফর্সা নিতম্ব। তখন তাকে একটি পিঁড়িতে বসিয়ে তার পিতা পিছন থেকে তার পা এবং হাত পেঁচিয়ে চেপে ধরে তার উরুসন্ধি উঁচু এবং উন্মোচিত করে তুলে ধরে হাজামের সামনে। তখন তারা আবার বালকের সামনে উবু হয়ে বসা ইসমাইল হাজামকে দেখতে পায় দ্রুত ক্রিয়ারত। তাদের মনে হয় যে, ইসমাইল হাজামের হাত এত দ্রুত কাজ করে যে, বালকটি গোঙানোর সময় পায় না, যেন একটিমাত্র মুহূর্তে হাজামের ক্ষুর বালকের শিশ্নাগ্র পেঁয়াজের নরম খোসার মতো ছিন্ন করে এবং সেই একটি মুহূর্তের ভেতরই তারা শুনতে পায় বালকের চিৎকার। পরমুহূর্তে তারা হাজামকে যেন ক্ষুর হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, ক্ষুর বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে এবং তাদের মনে হয় যেন, যে তৃষ্ণা ইসমাইল হাজাম তার ক্ষুরের শরীরে জাগিয়ে তুলেছিল তা রক্তের স্বাদ পেয়ে নেমে আসে। এবার সবকিছু দেখা হলে পড়ে মহল্লার লোকেরা হাসে। এই সময় ইসমাইল হাজাম ভেতর থেকে বের হয়ে আসে, সে উপস্থিত কাউকে কিছু বলে না, কারো দিকে তাকায়ও না, কিন্তু তারা বুঝতে পারে যে বদু মওলানার ছোট ছেলের খাতনা হয়ে গেল। এরপর তারা যার যার বাড়িতে ফিরে যায় এবং ফেরার পথে তাদের মনে পড়ে যে বদু মওলানা তাদেরকে ডেকে নিয়ে উঠোনে বসিয়ে রাখা ছাড়া এক গ্লাস শরবত দিয়েও আপ্যায়ন করে নাই। তারপর তারা ব্যাপারটি ভুলে যায় এবং এর ছমাস দশ দিন পর আবদুল গণি মাইকের সামনে উপুড় হয়ে ইসমাইল হাজামের নামোচ্চারণ না করা পর্যন্ত তা আর মনে করার প্রয়োজন এবং সময় তাদের হয় না। আবদুল গণির কথা শুনে তারা বুঝতে পারে যে ইসমাল হাজামের ক্ষুরে ধার দেয়া দেখানোর জন্যই কেবলমাত্র বদু মওলানা সেদিন তাদেরকে তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রেখেছিল, কারণ তারা জানতে পারে যে, সেদিন ইসমাইল হাজাম আবুল বাশারের খাতনা করে নাই এবং সেই নাটকের পরবর্তী দিন আসার আগেই সে নিহত হয়। তাকে সে রাতেই তার মালিটোলার বাসা থেকে ডেকে এনে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে জবাই করা হয়। লক্ষ্মীবাজারের লোকেরা জানতে পারে যে, ছমাস দশ দিন আগে জুনের উত্তপ্ত সেই দুপুরে ইসমাইল হাজামকে আবুল বাশারের শিশ্নাগ্র ছিন্ন করতে হয় নাই। তাকে শুধু ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছিল এবং কিছুক্ষণ পর তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়া হয় এবং বলা হয় মুখ বন্ধ রাখার জন্য। ইসমাইল হাজাম মুখ খোলে নাই, কারণ মহল্লার লোকদের মনে পড়ে যে ইসমাইল হাজামের চোয়াল পাথরের মতো দেখাচ্ছিল এবং সে উঠোনে বসা কারো দিকে না তাকিয়ে আতা গাছের ছায়ার দিকে গিয়েছিল। তবু এখন সকলে বুঝতে পারে, ইসমাইল ক্ষুব্ধ হয়েছিল। হয়তো ব্যাপারটি এমন ছিল যে, সে অসীম ধৈর্য এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তার ক্ষুরে যে ধার চড়িয়েছিল সেটা নিশ্চুপভাবে নামিয়ে নেয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং তার হয়তো মনে হয়েছিল যে, কোনোভাবেই কিছু বলতে না পারলে তার পক্ষে জীবন ধারণ অসম্ভব। এখন মহল্লার লোকেরা ভিক্টোরিয়া পার্কের চত্বরে দাঁড়িয়ে আবদুল গণির কাছ থেকে জানতে পারে যে, আতা গাছের প্রতারক সবুজ ছায়ায় প্রবেশ করে ইসমাইল হাজামের নিজের ওপর প্রতিষ্ঠিত নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যায়, টিনের হাতবাক্সে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখার সময় সে নিম্নস্বরে বিড়বিড় করেছিল। যেন নিজের সঙ্গে কথা বলেছিল, এমনভাবে উচ্চারণ করেছিল একটি বাক্য, যে বাক্যটি আবদুল গণির মুখ থেকে এবার মহল্লার লোকেরা শোনে, হালার হিজড়ার আবার মুছলমানি! এ সময় একটিমাত্র লোক

তার শ্রুতিসীমার ভেতর ছিল এবং দুর্ভাগ্যক্রমে সেই লোকটি ছিল আবদুল গণি। সে তখন লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে দাঁড়িয়ে ছিল আর মালিটোলার ইসমাইল তাকে চিনতে পারে নাই। হয়তোবা আতা গাছের সবুজ ছায়ার ক্লোরোফিল তার চেতনা নাশ করেছিল সেই মুহূর্তের জন্য অথবা সে হয়তো আবদুল গণিকে সত্যি চিনত না। আবদুল গণি বলে যে, যখন ইসমাইল হাজাম এই কথা বলে তখন সে তার অর্থ বুঝতে পারে নাই, কারণ ব্যাপারটি তার জানা ছিল না। কিন্তু শত্রুপরিবৃত এই দেশে একজন সতর্ক রাজাকার হিসেবে এমনকি হাওয়ার গতিপ্রবাহ সম্পর্কেও সে বদু মওলানাকে সব সময় অবহিত রাখত। তাই সে ইসমাইল হাজামের নিজে নিজে কথা বলাটি বদু মওলানাকে সঙ্গত কারণেই অবহিত করেছিল। তার কথা শুনে বদু মওলানা প্রথমে বিচলিত-শীতলতার সঙ্গে তাকে সতর্ক করে, যাতে করে এই নিন্দা এবং কুৎসা তার কাছ থেকে দ্বিতীয় কানে না যায় এবং তারপর বদু মওলানা তার বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি অপরিসর আয়তক্ষেত্রের মতো আকাশের দিকে বিষণ্ন চোখ রেখে যা বলে, তার ফলে সেদিন রাতে ইসমাইল হাজাম দেখে, প্রাইমারি স্কুলের আধো অন্ধকার ঘরে ছুরি হাতে অপেক্ষমাণ একজন মানুষ। সে, সেই অন্ধকারের ভেতর জবাইয়ের এই অস্ত্রের ঔজ্জ্বল্য দেখে বুঝতে পারে, গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে এই অস্ত্রের ধাতুতে ধার তোলা হয়েছে এবং এই উন্মুখ অস্ত্র এবং অস্ত্রধারী রক্তপানবিনা তৃপ্ত হয় না। আবদুল গণির কাছ থেকে লোকেরা জানতে পারে যে, আজীবন ছেদন-অস্ত্রের ধাতব প্রবৃত্তির সঙ্গে বসবাস করে ইসমাইল হাজামের আপাত মূর্খতার ভেতর যে ব্যবহারিক প্রজ্ঞা গড়ে উঠেছিল, তার দ্বারা সে অপেক্ষমাণ কসাইয়ের ছুরি দেখে তার ঘৃণা এবং ভালোবাসার, দুঃখ এবং বিরল উল্লাসের এই জীবনের প্রান্ত শনাক্ত করতে পারে। জবাইয়ের সময় জোর করে শোয়ানোর জন্য উপস্থিত তিনজন রাজাকারের বলপ্রয়োগ ছাড়াই সিমেন্টের শীতল মেঝের ওপর সে নিজেকে সমর্পণ করে। উপস্থিত জনতা আবদুল গণির বর্ণনা থেকে বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করে যে, তার অন্তিম মুহূর্তে ইসমাইল হাজাম একজন অভিযাত্রীর মতো অবিভূত হয়েছিল। যেমন, রৌদ্র এবং তুষারপাতের ভেতর দিয়ে উনত্রিশ হাজার আটাশ ফুট বেয়ে ওঠার পর শেষ পদপাত করে তেনজিং নোরগে হয়তো বলেছিল, এই-ই এভারেস্ট; তেমনি, আবদুল গণির কাছ থেকে জানা যায় যে, ছুরির নিচে মাথা রেখে ইসমাইল হাজাম একবার শুধু বলে, এ্যামনে এইটা শ্যাষ হইল। ইসমাইল হাজামসহ আবদুল গণি তিনটে তালিকার একুশ জনকে শনাক্ত করতে পারে এবং জানায় যে তাদের সকলেই মৃত। তার কাছ থেকে শোকাহত এবং ক্রুদ্ধ লোকেরা জানতে পারে যে, এদের প্রত্যেককে জবাই করে দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং মস্তকহীন ধড় রাতের বেলায় রিকশা ভ্যানে করে নিয়ে গিয়ে বুড়িগঙ্গা নদীতে ফেলে দেয়া হয় এবং ছিন্ন মুণ্ডু নিয়ে গিয়ে খ্রিস্টানদের কবরস্থানে পুঁতে ফেলা হয়। তখন, তার কথা শুনে, লক্ষ্মীবাজারের লোকেরা, নয়াবাজার এবং সিদ্দিকবাজারের লোকেরা, পটুয়াটুলি এবং নারিন্দার লোকেরা ভিক্টোরিয়া পার্কের চত্বর শূন্য করে খ্রিস্টানদের কবরস্থানের দিকে যায়। যারা ভিক্টোরিয়া পার্কের এই সমাবেশে আসে নাই অথবা আসতে পারে নাই তারা পৌষের মরা অপরাহ্ণে জিলকদ মাসের তিন তারিখে দেখে মহরমের আশুরার দিনের মতো নীরব এবং শোকার্ত এক জনতা নারিন্দা দিয়ে অথবা পদ্মনিধি লেনের ভেতর দিয়ে অথবা রথখোলার মোড় ঘুরে টিপু সুলতান রোড দিয়ে হেঁটে যায়; তারা উত্তর-পূর্বে খ্রিস্টানদের কবরস্থানের দিকে প্রবাহিত হয়। তারা কবরস্থানের দেয়ালের বাইরে পুরনো

রেললাইনের পাশে খনন করে ছাপ্পান্নটি মাথার খুলি পায় এবং এর ভেতর থেকে আবদুল গণির শনাক্ত করা একুশটি বেছে বের করতে পারে না। পানিতে ধুয়ে ঝকঝকে পরিষ্কার করে তারা মাথার খুলিগুলো যখন মাটির ওপর বিছানো কলাপাতার ওপর সাতটি সারিতে সাজিয়ে রাখে তখন তাদের মনে হয়, সবুজ রঙের জমিনে এক অপূর্ব জামদানি সৃজন করেছে যেন প্রকৃতি ও মানুষের করোটি মিলে। বিষাদঘন সেই অপরাহ্নে মহল্লার লোকদের কলাপাতার ওপর বিছানো করোটি দেখে এক বুটিতোলা জামদানি শাড়ির কথা মনে হয়েছিল, যে জামদানি অঙ্গে ধারণ করে, এখন তাদের মনে হয়, তাদের মা এবং প্রেমিকারা, কন্যা এবং কন্যাদের কন্যারা জীবনের উৎসবে সঞ্চারিত হয়। সে দিন লক্ষ্মীবাজারের লোকেরা দেখেছিল যে, তাদের পাঁচজন নিখোঁজ লোককে, আবদুল গণি যাদেরকে মৃত বলে শনাক্ত করেছিল, বিচ্ছিন্ন করে বেছে নেয়া যায় না, যেমন মহল্লায় প্রথম যেদিন পাকিস্তানি মিলিটারি আসে সেদিন তারা তিনজন নারীকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে নাই। সেদিন মিলিটারি চলে যাওয়ার পর মহল্লার লোকেরা সাতটি লাশ এবং নিজে নিহত না হওয়ার বিস্ময় নিয়ে যে সময়টায় চূড়ান্ত অবসাদে ডুবে ছিল, সেই সময়ও তারা তাদের নারীদের মুখে লাঞ্ছনার বিষণ্নতা দেখেছিল। মহল্লার প্রতিটি বালক এবং বালিকার কাছে, পুরুষ এবং রমণীর কাছে যেন এই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল যে, জগৎ-সংসারে একটি ব্যাপার আছে, যাকে বলাৎকার বলে। তারা আজীবন যে দৃশ্য দেখে কিছু বোঝে নাই– যেখানে একটি মোরগ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় মুরগিকে– মহল্লায় মিলিটারি আসার পর তাদের মনে হয়েছিল যে, প্রাঙ্গণের মুরগির মতো তার মা এবং কিশোরি কন্যাটি, পরিচিত ভালোবাসার স্ত্রী, তাদের চোখের সামনে প্রাণভয়ে এবং অনভিপ্রেত সহবাস এড়ানোর জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে। ব্যাপারটি এমন মর্মান্তিকভাবে তাদের জানা থাকে যে, তাদের বিষণ্নতা ছাড়া আর কোনো বোধ হয় না। তাদের বিষণ্ন লাগে কারণ, তাদের মনে হয় যে, একমাত্র মুরগির ভয় থাকে বলাৎকারের শিকার হওয়ার আর ছিল গুহাচারী আদিম মানবীর। কিন্তু পাকিস্তানি মিলিটারি এক ঘণ্টায় পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে মানুষের বুনে তোলা সভ্যতার চাদর ছিঁড়ে ফেলে এবং লক্ষ্মীবাজারের লোকেরা তাদের মহল্লায় মানুষের গুহাচারিতা এক মর্মান্তিক অক্ষমতায় পুনরায় অবলোকন করে; তারা মা এবং ছেলে, পিতা এবং যুবতীকন্যা একসঙ্গে বলাৎকারের অর্থ অনুধাবন করে। এই সময় কিশোর আবদুল মজিদ তার যুবতী বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। তখন মিলিটারি চলে গেছে এবং তারা উন্মত্ত ঝড়ের পর ক্লান্ত বৃক্ষশাখার মতো স্থিত হয়েছে, সেই সময় আবদুল মজিদ মোমেনার মুখের দিকে কেন যেন তাকিয়ে দেখে। বলা যায় যে, সে হয়তো তার বোনের চেহারায় কিছু খুঁজছিল না, নিশ্চিত করে কিছু ভাবছিলও না, শুধুমাত্র মিলিটারি চলে গেছে এই ভাবনা ছাড়া, তা সত্ত্বেও, সে তার মোমেনা আপার চেহারায় মলিন বিষণ্নতা দেখেছিল এবং মোমেনা বুঝতে পেরেছিল যে, আবদুল মজিদ তার বিষণ্নতা দেখছে। কিংবা, সত্য এ-ও হতে পারে যে, আবদুল মজিদ হয়তো মোমেনার বিষণ্নতাও দেখছিল না, হয়তো শুধু চোখ রেখেছিল, দৃষ্টি নিয়োজিত করে নাই; তবু মোমেনা তাকে ধমক দিয়েছিল, কি দেখচ তুই বারে বারে! তখন আবদুল মজিদের এই কৃষ্ণ দিনের ভেতর অন্য এক কৃষ্ণতর দিনের কথা মনে পড়েছিল যখন মোমেনা একইভাবে বলেছিল, কি দেখচ তুই! একাত্তর সনের এপ্রিল মাসের দুই তারিখে জুম্মার দিন জিঞ্জিরায় তারা যখন মিলিটারির তাড়া খেয়ে একটি অপরিচিত বাড়ির দোতলায় আশ্রয় নিয়ে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে বসেছিল তখন তার

চোখ পড়ে তার প্রৌঢ়া মায়ের ওপর, মোমেনার আতঙ্কিত ঘর্মাক্ত মুখ এবং ক্রন্দনরত ছোট দুটো বালিকা বোনের ওপর। আবদুল মজিদ তার মা, ছোট দুই বোন এবং তার মোমেনা আপার দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখে নাই। আসলে তার মনে হয়, সেই নয় মাস তার বোনের দিকে তাকিয়ে দেখা তার হয়ে ওঠে নাই এবং সে বস্তুত তাকে যখন প্রথম দেখে তখন তার গলায় খয়েরি জবার মতো ক্ষত ছিল, মুখটা কাত হয়ে ছিল এভং চোখ অনন্তের দিকে মেলা ছিল। কিশোর আবদুল মজিদ বুকের ওপর দুহাত চেপে ধরে তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছিল এবং চোখ রেখেছিল চোখের ওপর। কিন্তু তখন সে বলে নাই, কি দেখচ তুই; যেমন জিঞ্জিরার সেই ঘরের ভেতর বলেছিল। জিঞ্জিরার সেই ঘরের ভেতর মোমেনার ভর্ৎসনায় আবদুল মজিদের কিছুই মনে হয় নাই অথবা সে তখন তার কথাটি ঠিকমতো শোনে নাই। মাঠ, রাস্তা এবং হিন্দুদের পোড়ো বাড়ির ওপর দিয়ে তার মা এবং তিন বোনসহ ছুটে আসার পর তারা যখন এই বাড়িতে আশ্রয় পায় এবং দোতলায় একটি ঘরের মেঝের ওপর তাদেরই মতো ছুটে আসা মানুষের ভিড়ের ভেতর বসে তখন আবদুল মজিদের মনে হয়েছিল যে, তার অস্তিত্ব থেকে চেতনা বিযুক্ত এবং দেহের ওপর মনের ক্রিয়া স্থগিত হয়ে গেছে। সেই বিহ্বল মুহূর্তগুলোয় সে দেখে যে, তার হাতগুলো আর কাজ করে না, কাঁধ থেকে অপ্রয়োজনীয় বোঝার মতো ঝুলে থাকে এবং সে বুঝতে পারে যে তার পাজামা উরুর কাছে ভিজে যাচ্ছে আর এই প্রক্রিয়া সে কোনোভাবেই রোধ করতে সক্ষম হয় না। এখন আবদুল মজিদের মনে হয়, সে সময় সে চেতনা এবং চেতনাহীনতার মধ্যের এক বিপজ্জনক তৃতীয় স্তরে অসহায়ের মতো নিজের নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেরই প্রত্যঙ্গের স্বাধীন হয়ে যাওয়া প্রত্যক্ষ করেছিল। সে তখন তার অসহায়তা নিয়ে তার মা এবং মোমেনার মুখের দিকে তাকিয়েছিল এবং তখন মোমেনা তাকে বলেছিল, কি দেখচ তুই! তারপর আবদুল মজিদের দেহ-তরল যখন তার সকল ভয় এবং বিপন্নতাকে অবজ্ঞা করে গড়িয়ে বের হয়ে আসতে থাকে তখন নিমজ্জিত বালকের কাছে বোনের ঐশ্বর্য প্রকাশিত হয়। মোমেনা তার লজ্জা ঢেকে দেয়, সে তার শাড়ির আঁচলে মেঝেতে নেমে আসা আবদুল মজিদের মূত্ররস মুছে নেয়। তারপর আবদুল মজিদের মনে হয় যেন তার দেহ এবং মনের ভেতর ছিন্ন হয়ে যাওয়া সঙ্গতি ফিরে আসে এবং বিহ্বলতার স্তর অতিক্রম করে সে হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে থাকে। তখন, প্রৌঢ়া এবং ভীত জন্তুর মতো চুপ করে বসে থাকা তার মা বুঝতে পারে, তার ছেলেটি কত ছোট এবং সে তার মাথা টেনে নিয়ে নিজের বুকের ওপর স্থাপন করে, চুমো খায়, বলে, বাপ, বাপ আমার! কিন্তু কিশোর আবদুল মজিদের অপৌরুষ এই একদিন ছাড়া আর প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পায় না। বস্তুত মার্চের ছাব্বিশ তারিখের সকালে যখন সূর্যের আলো ফোটে এবং দরজা খুলে তারা যুদ্ধের প্রথম দিনটির ভেতর দাঁড়ায় তখন তার মা আর বোনদের দিকে তাকিয়ে আবদুল মজিদের ভেতর অবচেতনভাবে সেই বোধটির জন্ম হয়, প্রতিটি পুরুষের ভেতর যে বোধ একসময় জন্মে, যে, এই লোকগুলোর দায়িত্ব তার। আবদুল মজিদ সেদিন মহল্লার রাস্তায় নেমে দেখেছিল যে, প্রতিটি মানুষ আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে গেছে আর অনুভব করেছিল চারদিকে জমাট হয়ে আসা স্তব্ধতা। সে তখন মহল্লা থেকে বের হয়ে লুকিয়ে ভিক্টোরিয়া পার্ক পর্যন্ত যায়! নয়াবাজারের দিক থেকে সে ধোঁয়া উড়তে দেখে, তার নাকে পোড়া কয়লার গন্ধ আসে। ঘরে ফিরে সে তার মা এবং বড় বোনের দিকে তাকায়, মহল্লার মানুষের ভেতর যে স্তব্ধতা সে দেখেছিল সেই চাপা দেয়া নির্বাক ভয় সে দেখতে পায় তার মা আর বোনদের

ভেতর। সে নিজের ভেতরও এক বোবা আতঙ্ক পরিষ্কার দেখতে পায়, তবু পঁচিশ তারিখের শেষ রাতে গুলি আর হৈচৈয়ের শব্দে ঘুম ভেঙে উঠে তারা যখন দিশেহারা হয়ে পড়ে, দেখে আগুনের লেলিহান শিখায় দেশ পুড়ছে, তখন আবদুল মজিদকে বলতে হয়, ডরায়ো না। পরদিন উপদ্রুত মানসিক অবস্থার ভেতর তারা দেখে যে, কারফ্যুর ভেতরও মহল্লার লোকেরা পালাতে থাকে। হিন্দুরা সবার আগে এবং অলক্ষ্যে বাড়িঘর ছেড়ে চলে যায়, তাদের পেছন পেছন পালাতে থাকে মুসলমানরা। বিকেল নাগাদ মহল্লার নিস্তব্ধ রাস্তায় ঝিঁঝির ডাক শোনা যেতে থাকে। মহল্লা খালি হয়ে আসায় তার মা আরো বিচলিত হয়ে পড়ে, আবদুল মজিদেরও মনে হয় যে এভাবে একা মহল্লায় থাকা যায় না। তবু তারা মহল্লায় থেকে যায় যেহেতু তারা বাড়ি ছেড়ে কোথায় যাবে তা ঠিক করতে পারে না এবং তাদের পাশের বাড়ির রহিম ব্যাপারি বলে যে, সেও কোথাও যাবে না। কিন্তু তার পরদিন সে পরিবার নিয়ে দরজায় তালা ঝুলিয়ে চলে গেলে আবদুল মজিদের মা ভেঙে পড়ে। এই অবস্থায় আবদুল মজিদ তার পরিবার জিঞ্জিরায় নিয়ে যায় এবং মাত্র একটি রাতের ব্যবধানে, যেন এক দুঃস্বপ্নের পর, মা এবং বোনদের হাত ধরে পুনরায় মহল্লায় ফিরে আসে, দরজার তালা খুলে ঘরে ঢুকে আশ্চর্য রকমের নিরাপদ বোধ করে এবং তারা বলে যে, তারা আর বাড়ি ছেড়ে যাবে না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা এটা দেখতে পেয়েছিল যে, বাড়ির ভেতরটাও আর নিরাপদ ছিল না এবং পরিণতিতে একদিন কিশোর আবদুল মজিদকে খুঁজে বের করে বয়ে নিয়ে আসতে হয় মোমেনার লাশ। যেদিন রহিম ব্যাপারি মহল্লা ত্যাগ করে এবং আবদুল মজিদের মা অস্থির হয়ে পড়ে সেদিন তখন আবদুল মজিদের যে অনুভূতি হয়, সেটা ছিল দিক্‌চিহ্নহীন সাগরে কোনো নাবিকের বন্দরের বাতিঘর খোঁজার মতো একটি ব্যাপার। প্রথমে তার মনে হয়, কুমিল্লার গ্রামে তার খালার বাড়ি তারা যেতে পারে কিন্তু একই সঙ্গে এটাও সে বুঝতে পারে যে, অতদূর তারা যেতে পারবে না। তারপর তার আনোয়ারের নাম মনে আসে এবং সে ঠিক করে যে, সে তার মা-বোনদের নদী পার করে আনোয়ারদের বাড়িতে নিয়ে যাবে। এপ্রিলের এক তারিখে দুপুরের পর তারা দ্রুত গুছিয়ে নিয়ে রাস্তায় বের হয়। রাস্তার নির্জনতায় তাদের মনে হয় যেন তারা কোনো এক তেপান্তরে এসে পড়েছে এবং হয়তোবা এখন দিনের বদলে রাত। মহল্লা থেকে ভিক্টোরিয়া পার্ক পর্যন্ত পথটুকু তারা রাস্তার ধার ঘেঁষে নিশ্চুপ ছায়ার মতো এগিয়ে গিয়ে রিকশায় চড়ে। এই সমূটুকুতে সেদিন কারফ্যু ছিল না, তাদের রিকশা আমরানিটোলা মাঠের পাশ দিয়ে জেলখানার সামনে এসে উঠেছিল। জেলখানার সামনে এসে চারদিকে বালুর বস্তার বাঙ্কারের ভেতর তাক করে রাখা মেশিনগানের নল আর খাকি পোশাকপরা মিলিটারি দেখে তাদের নির্জনতার বোধ আরো বেড়ে যায়, আবদুল মজিদ দম বন্ধ করে রাখে কিন্তু তার মা নিজের আতঙ্ক আর ধরে রাখতে পারে না, সে শব্দ করে কলেমা পড়তে থাকে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুল্লাহ। এভাবে রিকশা তাদেরকে নিয়ে চকসার্কুলার রোড ঘুরে চম্পাতলীর সংকীর্ণ গলির ভেতর দিয়ে গিয়ে সোয়ারীঘাটে বুড়িগঙ্গার তীরে নামিয়ে দেয়। কেরায়া নৌকোয় নদী পার হয়ে তারা যখন জিঞ্জিরার মাটিতে পা রাখে, তারা ফেলে যাওয়া অন্য পারের দিকে তাকায়, তাদের মনে হয় যে, জিঞ্জিরা এক স্বাধীন দেশ, তাদের আর ভয় নাই। তারা দেখে অসংখ্য মানুষ নদী পার হয়ে এপারে উপচে পড়ে এবং এই জনতা এপারের মাটিতে পা রেখে কেমন নিশ্চিন্ত এবং সজীব হয়ে ওঠে। তারা সে সময় বুঝতে পারে না যে, পলায়নের জন্য দেশে বস্তুত তখন কোনো জায়গা ছিল না; আর

AMARBOI.COM

জিঞ্জিরা তো ছিল একেবারে নাগালের ভেতর। আবদুল মজিদ এবং তার পরিবার কলেজিয়েট স্কুলে তার সহপাঠী আনোয়ারদের চড়াইল গ্রামের বাড়িতে একটি রাত যে নিশ্চিন্ততার আত্মপ্রবঞ্চনার আড়ালে তৃপ্তির সঙ্গে ঘুমায়, সেটা পরদিন খুব ভোরে নদীর ওপার থেকে তোপ দেগে পাকিস্তানি মিলিটারি চুরমার করে দেয়। সেদিন দুপুর নাগাদ যখন জিঞ্জিরার অপারেশন শেষ হয় তখন আবদুল মজিদ, তার মা এবং বোনের এই বোধ জন্মে যে, পালানোর জায়গা নেই। পাকিস্তানি মিলিটারির আক্রমণের মুখে আনোয়ারদের বাড়ি ছেড়ে পালাতে গিয়ে তারা যখন দেখেছিল যে মিলিটারি বৃত্ত রচনা করে আছে তখন তারা মাঠের ভেতর সেই দোতলা বাড়িটিতে আশ্রয় নেয়, যেখানে আবদুল মজিদের দেহযন্ত্র ক্ষণিকের জন্য ভেঙে পড়ে। তারপর সেদিন বিকেলে তারা আবার লক্ষ্মীবাজারে তাদের বাড়িতে ফিরে আসে এবং তারা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করে যে, দুদিনের ভেতর মহল্লার অন্য সকলে প্রত্যাবর্তন করে, কেবলমাত্র হিন্দুদের বাড়িগুলো পরবর্তী ন মাস জনমানবহীন থেকে যায়। মহল্লার লোকেরা পরে জেনেছিল যে পঁচিশ তারিখের পর প্রতিটি প্রাণী বাড়ি ত্যাগ করেছিল, কেবলমাত্র দুজন ছাড়া। এদের একজন ছিলেন খাজা আহমেদ আলী, শনিবার সন্ধ্যায় লক্ষ্মীবাজারে একমাত্র তিনি বাতি জ্বালিয়েছিলেন। মহল্লার লোকেরা জেনেছিল যে, এ সময় আর একজন লোক বাড়ি ছাড়ে নাই, সে বদু মওলানা। এ সময় তার বাড়ি ছাড়ার প্রয়োজন ছিল না, যদিও মহল্লার লোকেরা মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত তাকে একাবরও দেখে নাই। পরে তারা জেনেছিল যে, সে নিজের বাড়িতেই লুকিয়ে ছিল, কারণ পঁচিশে মার্চের গোলাগুলি আর ঢাকার আকাশের আগুনের শিখা দেখে সে বুঝতে পারে যে, 'জয় বাংলা' শেষ হয়ে গেছে এবং সংকট শেষে তার সুসময় আসার এই অন্তর্বর্তী সময়টিতে সে হঠাৎ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনায় মরে যেতে চায় নাই। মহল্লার লোকেরা পরে জানতে পারে যে, বদু মওলানা এই কটি দিন তার রান্নাঘরের পাশে অন্ধকার ভাঁড়ার ঘরে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। এখান থেকে বের হয়ে বদু মওলানাকে কবে প্রথম রাস্তায় নেমে আসতে দেখা গিয়েছিল তা মহল্লার লোকেরা মনে করতে পারে না, তবে তারা বলে যে, তারা যেদিন তাকে আলখাল্লা পরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসতে দেখে, তাদের ভয় হয়েছিল এবং এই ভয়ের কারণে তাদের এক ধরনের ঘৃণা হয়েছিল। তাদের মনে হয়েছিল যে, এই লোকটিকে তারা আগে কখনো যেন দেখে নাই এবং এই লোকও দেখে নাই তাদেরকে, সে জানে না, যে, লক্ষ্মীবাজারের বাড়িঘর পঁচিশ তারিখের রাতের পর নয়াবাজারের আগুনের ভৌতিক লাল আভায় ডুবে ছিল এবং গুলির শব্দে মহল্লার লোকেরা দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল আতঙ্কে। তাদের মনে হয়েছিল যে, মহল্লার লোকেরা যখন ছিল বিপর্যস্ত তখন বদু মওলানা ছিল একমাত্র লোক, যে এসব কিছুর ভেতর সুস্থির ছিল। ভাঁড়ার ঘর থেকে বের হয়ে আসার পর রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় সে তার প্রতিবেশীদের আতঙ্কিত মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আসসালামু আলাইকুম। তবু, এ সময় বদু মওলানাকে নিয়ে তাদের যে অনুভূতি হয় তাতে অস্পষ্টতা থাকলেও, মহল্লায় প্রথম যেদিন মিলিটারি আসে এবং বদু মওলানা আবিষ্কৃত হয়, সে দিন তারা পরিষ্কার বুঝতে পারে যে, বদু মওলানাকে দেখে তারা আগেই চিনেছিল। এরপর থেকে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত মহল্লার লোকেরা যেন এক মড়কের ভেতর দিয়ে পার হয়ে আসে। একাত্তর সনে মহল্লার সংকীর্ণ গলিতে মোট দুবার মিলিটারি আসে। মহল্লার লোকেরা বলে যে, মহল্লায় প্রথমবার মিলিটারি আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বদু মওলানাকে খুঁজে বের করা; বদু মওলানা

প্রথমেই 'হাজির হুজুর' বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং তারপর মহল্লার লোকেরা তাকে চিনেছিল মহল্লার দণ্ডমুণ্ডের মালিকরূপে। প্রথম দিন সাতজন লোক এবং বদু মওলানার ছোট ছেলের পোষা কুকুর ভুলুকে গুলি করে মারার পর মিলিটারি চলে গিয়েছিল। সেই মিলিটারিদের নেতা ক্যাপ্টেন ইমরান জিপে ওঠার আগে ভেবেছিল যে, তার পেশাব করা প্রয়োজন এবং সে তখন একটি ল্যাম্পপোস্টের নিচে, দেয়ালের কিনারায় পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে প্যান্টের সামনের বোতাম খুলে আয়েশ করে পেশাব করতে থাকে। এ সময় মিলিটারি সিপাইরা তাদের ট্রাকে গিয়ে ওঠে, ক্যাপ্টেনের জিপের ড্রাইভার ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বসে থাকে; তখন মধ্যাহ্নের রোদের ভেতর শুধু বদু মওলানা হাত দুটো নাভির নিচে বেঁধে বিনীত এবং কোমল এক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেনের পেশাব করা দেখে। মহল্লার লোকেরা যখন সাতটি লাশ নিয়ে নিশ্চুপ বসে ছিল এবং বদু মওলানার ছোট ছেলে, ভুলু নিহত হওয়ায় কাঁদছিল, তখন বদু মাওলানা পেছন থেকে, দীর্ঘদেহী যুবক পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের দুপায়ের মাঝখানে তরলবিদ্যুৎ রেখার মতো একটি সাদা ধারা মাটিতে ক্রমাগতভাবে বিদ্ধ হতে দেখে। বদু মওলানার সমস্ত শ্রবণেন্দ্রিয় জুড়ে এই জল-পতনের শব্দ ছড়িয়ে থাকে এবং ক্যাপ্টেন এত আয়েশ করে এই ক্রিয়াটি সম্পাদন করে যে, মনে হচ্ছিল যেন অনন্তকাল ধরে সে এই কাজটি করে যাবে এবং বদু মওলানর চেতনা জুড়ে ক্যাপ্টেনের পেশাব করার ভোঁতা শব্দ একটি হালকা সঙ্গীতধ্বনির মতো তার জীবনকাল পর্যন্ত ভেসে বেড়াবে। সে সময় মহল্লায় যারা বদু মওলানাকে দেখেছিল তারা বলেছিল যে, তাদের মনে হয়েছিল, বদু মওলানা যেন একটি স্বপ্নের ভেতর দাঁড়িয়ে ছিল। ক্যাপ্টেনের পেশাব করা শেষ হলে সে বোতাম লাগিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, তখন বদু মওলানার চোখে পড়েছিল ক্যাপ্টেনের পেশাববিদ্ধ ক্ষতবিক্ষত জমিতে জমে আছে ফেনার রঙিন বুদ্বুদ। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর ক্যাপ্টেন, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা বদু মওলানাকে পুনরায় শনাক্ত করে তার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল জিপে ওঠার আগে। বদু মাওলানা তখন হেসেছিল, সে হাসি কেমন ছিল মহল্লার লোকেরা এখন তা কাউকে বলতে পারে না, তারা শুধু নিজেরা বুঝতে পারে, যারা সেদিন ক্যাপ্টেনের হাতের ছোঁয়ায় বদু মওলানার মুখে সেই হাসি উদ্ভাসিত হতে দেখেছিল। মুখের সে হাসি নিয়ে বদু মওলানা লম্বা আলখাল্লা পরে কাঁধে স্কার্ফ ঝুলিয়ে মহল্লার রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। মহল্লার লোকেরা পরে লক্ষ করেছিল যে, বদু মওলানা তার সেই ধূসর রঙের কামিজ আর গায় দিচ্ছিল না। তারা বলে যে, তারা মনে করেছিল, বোতাম লাগানোর সময় ক্যাপ্টেনের হাতে প্রস্রাব লেগে যায় এবং সে তার ভেজা হাত নিজের পকেটে রুমাল না থাকায় বদু মওলানার পিঠের কাপড়ে মোছে। কিন্তু তারা পরে জেনেছিল যে, তাকে ক্যাপ্টেন ছুঁয়েছিল এই ব্যাপারটির প্রতি সম্মান দেখানো এবং স্মৃতি ধরে রাখার জন্যই সে তার জোব্বাটি সংরক্ষণ করেছিল। বদু মওলানা ডিসেম্বর মাসে পালিয়ে যাওয়ার পর, যেদিন লোকেরা তার বাড়ির সব মালামাল এনে আজিজ পাঠানের বাসায় জড়ো করে সেদিন আজিজ পাঠানের স্ত্রী সব দেখে বলেছিল যে, শুধু একটি আলখাল্লা আর একটি কাঁধের স্কার্ফ ছাড়া সব তাদের। মহল্লার লোকেরা তখন বহুদিন পর বদু মওলানার সেই ধূসর রঙের আলখাল্লাটি দেখতে পায়, তাদের তখন মনে পড়ে যে, পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন বদু মওলানার এই কাপড়ে পেশাব মুছেছিল আর তাতে সে, সেই অপার্থিব হাসিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল। মহল্লার লোকেরা তখন একটি লাঠির মাথায় করে বদু মওলানার আলখাল্লা এবং ওড়না মহল্লার রাস্তার মাথায় নিয়ে গিয়ে আগুন দিয়ে ভস্মীভূত

করে। সেটা ছিল একাত্তর সনের ডিসেম্বর মাসের একত্রিশ তারিখ। কিন্তু দুবছর পর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলে বদু মওলানা যখন লক্ষ্মীবাজারে ফিরে আসে মহল্লার লোকেরা তার গায়ে পুনরায় পপলিনের ধূসর সেই আলখাল্লা দেখতে পায়, বদু মওলানার মুখের সেই হাসিটি তখন শুধু থাকে না। এবার বদু মওলানা যেন পুনরায় শূন্য থেকে শুরু করে, মহল্লার লোকেরা তাকে পুনরায় মাটির দিকে তাকিয়ে হেঁটে যেতে দেখে। ফিরে আসার পর প্রথম দিন সে মহল্লার সকলের সঙ্গে বিনীতভাবে কুশল বিনিময় করে, সে একাত্তর সনে মহল্লায় নিহত আট ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যায়। মহল্লার লোকেরা পরে তাদের এই বিশ্বাসের কথা বলেছিল যে, এই দুঃসাহসিক কাজের দ্বারা সে আসলে সাতটি ক্ষতচিহ্ন পরীক্ষা করতে চেয়েছিল মাত্র। তখন সেই মঙ্গলবারের অপরাহ্নে আবদুল মজিদ তাদের প্রাঙ্গণের ফটকের কাছে কামিনী গাছতলায় বদু মওলানাকে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। কেমন আছ তোমরা? এই প্রশ্নের ভেতরকার পরিহাস এমন নিদারুণ ছিল যে, নিজের বাড়ির প্রাঙ্গণের ভেতর তা শুনে এবং বদু মওলানাকে দেখে আবদুল মজিদ বাক-রহিত হয়ে থাকে। তখন তার মা এগিয়ে এসে বদু মওলানাকে দেখে। কেমন আছেন আপনেরা? এই কুশল জিজ্ঞাসা যেন আবদুল মজিদের মায়ের সহ্যের বাইরে চলে যায়। ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত এবং শোকার্ত এই নারী দ্রুত বারান্দা থেকে প্রাঙ্গণে নেমে এসে চিৎকার করে উঠেছিল, তাকে অভিসম্পাত দিয়েছিল এবং হাহাকার করে বলেছিল, থুক দেই, থুক দেই, থুক দেই মুখে। একইভাবে এই নারী একদিন তার কন্যার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ দেখে হাহাকার করেছিল। তখন বদু মওলনাকে খুঁজে পাওয়া যায় নাই, সে তখন পালিয়েছিল। একাত্তর সনের ডিসেম্বরের সেই বিষণ্নতম বিকেলে আবদুল মজিদ যখন তার বোনের মৃতদেহ কুড়িয়ে আনে, সে সেটা একটি শাড়ি দিয়ে জড়িয়ে এনেছিল। মোমেনার দেহ আবদুল মজিদ বস্ত্রহীন দেখেছিল, আর দেখে তার মা, মেয়ের ছিন্নভিন্ন দেহ দেখে আবদুল মজিদের মায়ের কান্না জমে গিয়েছিল। মেয়েকে সে সেদিন গোষ গোসল করাতে দেয় নাই এবং কাফন ছাড়া, পরনের শাড়িতে জড়িয়ে তাকে দাফন করতে মহল্লার লোকদের বাধ্য করেছিল। স্খলিত চেতনার প্রান্ত থেকে বিভ্রমের প্রলাপের মতো মহল্লার সকলকে সে এই কথা বলেছিল যে, সে তার মেয়ের লাশ এ রকম রক্ত মাখা এবং কাফনহীন অবস্থায় হাসরের মাঠে আল্লাহর আরশের সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির করবে। বারান্দায় চৌকির ওপর শোয়ানো মৃত মোমেনার কাত হয়ে থাকা মুখে সে আদর করেছিল, রক্ত ও ধুলো জমা ঠোঁটে চুমো খেয়েছিল, আধ-বোজা চোখের দিকে তাকিয়ে হাহাকার করেছিল, মা রে, মা রে, মা রে। তখন মহল্লার সব লোক কামিনী গাছতলায় দাঁড়িয়ে চোখ আনত করে রেখেছিল, মহল্লার সব রমণী এবং শিশু ডুকরে কেঁদে উঠেছিল, তাবৎ বৃক্ষ শোকার্ত হয়েছিল। মহল্লার লোকেরা আবার এক মঙ্গলবারের হিমেল অপরাহ্নে আবদুল মজিদের মায়ের হাহাকার শুনতে পায়, থুক দেই, থুক দেই, থুক দেই মুখে। লক্ষ্মীবাজারের লোকেরা জানতে পারে আবদুল মজিদের মা কেন আবার হাহাকার করে; মহল্লায় আর এক বদু মওলানা প্রকাশিত হয়। মৃত খাজা আহমেদ আলী এবং খাজা শফিকের বিধবা স্ত্রীরা, আলাউদ্দিনের মা, পুত্রহারা আবু করিম এবং আরো তিনজন পুরুষ ও রমণী সেই শীতের মঙ্গলবারে তাদের বাড়ির প্রাঙ্গণের ভেতর বদু মওলানাকে দণ্ডায়মান দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। মহল্লার লোকেরা জানতে পারে যে, বদু মওলানাকে দেখে খাজা আহমেদ আলীর বিধবা স্ত্রী এবং খাজা শফিকের মা দ্রুত নেমে এসে

AMARBOI.COM

বদু মওলনাকে প্রাঙ্গণের গভীরে প্রবিষ্ট হওয়া থেকে আটকায়। তখন মহল্লায় যারা ছিল, তারা শুনতে পেয়েছিল একটি নারীকণ্ঠে উচ্চারিত হুঁশিয়ার ধ্বনি, খবরদার, খবরদার! তখন জয়নব বেগমকে যারা দেখেছিল তারা পরে বলে যে, উত্তোলিত হাতে তসবির মালা ঝোলানো জয়নব বেগমকে দেখে মনে হয়েছিল যেন সে তার প্রাঙ্গণে আযাযিলের পুনঃপ্রবেশ রোধ করতে চাচ্ছিল এবং তার চোখের আগুন দেখে বদু মওলানা একটিও কথা না বলে সেই উঠোন ছেড়ে একটি অপছায়ার মতো দ্রুত অপসৃত হয়েছিল। মহল্লার লোকেরা আলাউদ্দিনের মা এবং আবু করিমের স্ত্রীর কথাও শুনেছিল। তারা জানতে পারে যে, বদু মওলানাকে জানালা দিয়ে আঙিনায় দাঁড়ানো দেখে আবু করিমের স্ত্রী রান্নাঘরের ছড়ানো-ছিটানো তৈজসপত্রের ওপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে। মূর্ছা যাওয়া এই স্ত্রী লোকটিকে নিয়ে বাড়িতে হাঁকডাক পড়ে গেলে বদু মওলানা সে স্থান ত্যাগ করে আসে। আর তারা জানতে পারে যে, বদু মওলানা মৃত আলাউদ্দিনদের বাসায় বাইরের প্রাঙ্গণে কাউকে না পেয়ে গলি দিয়ে ভেতরের উঠোনে পৌঁছেই বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আলাউদ্দিনের মা, কুয়োতলা থেকে থালাবাসন ধুয়ে ঘরে আসার মুখে বদু মওলানা সামনে পড়ে গেলে, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। মহল্লার লোকেরা জানতে পারে যে, আলাউদ্দিনের মা হাতের বাসনকোসন বদু মওলানার মুখের ওপর ছুড়ে মারে। পরে পাশের বাড়ির একজন লোক, যে ব্যাপারটি দেখেছিল, বলে যে, সে তাদের ছাদে দাঁড়িয়ে থাকার সময় আলাউদ্দিনদের বাড়ির গলির ভেতর থেকে তাড়া খাওয়া শৃগালের মতো একটি লোককে ছুটে বেরিয়ে উঠোনের ফটক পার হয়ে পলায়ন করতে দেখে। সে বলে যে, লোকটি ছিল বদু মওলানা এবং বদু মওলানার পেছন পেছন সে খড়ির চুলোর ফুঁকনি হাতে মৃত আলাউদ্দিনের রণচণ্ডীবেশী মাকে ছুটে আসতে দেখে। সে আরো বলে যে, ছুটে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ফটকের চৌকাঠে লেগে বদু মওলানা আছড়ে পড়ে আর তখন পশ্চাদ্ধাবনকারিণী তার লোহার ফুঁকনি ছুড়ে মারে। সেদিন অপরাহ্নে যারা মহল্লায় ছিল না তারা পরে গভীর রাত পর্যন্ত জেগে বিশদ শুনেছিল তাদের কাছ থেকে, যারা ঘটনাগুলো চাক্ষুষ করেছিল অথবা অন্য কারো কাছ থেকে শুনেছিল। সে রাতে লক্ষ্মীবাজারের লোকদের ঘুম আসে নাই বলে পরদিন সকালে তারা একে অন্যকে বলেছিল। তারা বলেছিল যে, সে দিন রাতে তাদের স্ত্রীরা স্খলিত শয্যায় শোকার্ত রমণীর মতো পড়ে ছিল এবং তারা অস্থিরতার এক প্রবল প্রবাহে উড্ডীন হয়েছিল। সেই সকালে মহল্লার লোকেরা বদু মওলানাকে হেঁটে আসতে দেখেছিল, শুনেছিল 'আসসালামু আলাইকুম' বলতে। কিন্তু মহল্লার লোকেরা প্রত্যুত্তর দেয় নাই, তাদের মনে হয়েছিল যে, তাদের রাতজাগা শরীর এই কাজ করতে চায় না; তাদের মুখ এবং জিহ্বার বদু মওলানাকে প্রত্যাভিবাদন করার আগ্রহ নাই। তারা দেখেছিল যে, বদু মওলানার নাকের কাছে ফুলে আছে এবং সে খুঁড়িয়ে হাঁটে। তারা তাকে দেখে প্রথম ভেবেছিল যে, সে হয়তো ফজরের নামাজ শেষে মসজিদ থেকে ফিরছিল, কিন্তু পরে তারা জানতে পার যে, সে সেই ভোরে ফিরছিল আজিজ পাঠানের বাসা থেকে। তারা জেনেছিল যে, আগের দিন সন্ধ্যায় আলাউদ্দিনের মায়ের তাড়া খেয়ে সে ছুটে গিয়েছিল আজিজ পাঠানের বাসায়। কিন্তু তখন পাঠান বাসায় না থাকায় খুব ভোরে সে আবার যায়। লুঙ্গি এবং স্যান্ডো গেঞ্জির ওপর চাদর জড়িয়ে আজিজ পাঠান যখন দাঁত ব্রাশ করতে করতে বাইরের ঘরে আসে তখন বদু মওলানা অপরাধীর মতো দাঁড়িয়েছিল; তার পরস্পরকে আঁকড়ে থাকা হাত দুটো ছিল সামনের দিকে তলপেটের নিচে ঝোলানো, আর দৃষ্টি ছিল

পাঠানের ঘরের চামড়া ওঠা, চল্টানো পাকা মেঝের ওপর। মহল্লার লোকেরা পরে শুনেছিল যে, বদু মওলানা একটি কথাও আজিজ পাঠানের সামনে উচ্চারণ করে নাই, সে শুধু দাঁড়িয়েছিল নিশ্চুপ এবং বাঁকা হয়ে। আজিজ পাঠান ব্রাশ দিয়ে দাঁত ঘষছিল আর বারে বারে জানালা দিয়ে রক্ত আর লালা মাখানো পেস্টের থোকা থোকা আবিল ফেনা ফেলছিল। সে মুখের ভেতর জড়ো হয়ে আসা লালা আর ফেনা মেঝেয় পড়ে যাওয়া রোধ করতে করতে ভাঙা ভাঙাভাবে বদু মওলানাকে এবার ভালো হয়ে যেতে বলেছিল, সে বলেছিল যে, তার নেতা যেহেতু বদু মওলানাদের মাফ করেছে, তার নিজের কোনো প্রতিহিংসা নাই। মহল্লার লোকেরা জেনেছিল যে, তার এ কথায় বদু মওলানার চোখ দিয়ে পানি ঝরে পড়েছিল মেঝের ওপর এবং সেদিকে তাকিয়ে বিব্রত আজিজ পাঠান বলেছিল, কাইন্দেন না, কাইন্দেন না। মহল্লার লোকেরা আরো একটি কথা জানতে পেরেছিল, তা হলো, যে মঙ্গলবার রাতে তাদের নিদ্রাহীন কাটে সে রাতে মহল্লায় শুধু আজিজ পাঠান ঘুমিয়েছিল। মঙ্গলবার অপরাহ্নে বাসায় না থাকায় মহল্লার সাতজন নারী পুরুষের হাহাকার সে শুনতে পায় নাই। অনেক রাতে ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরে সে ঘুমিয়ে থাকে। সকালে বদু মওলানাকে দেখে সে বিচলিত হয়, তার নীরব বিষণ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে পারে না। তার মনে পড়ে, বিজয়ের পর মহল্লায় ফিরে সে জেনেছিল মহল্লায় সাতজনের নিহত হওয়ার কথা, দেখেছিল বিধবা এবং সন্তানহারা নরনারীর ম্লান মুখ, খাজা আহমেদ আলীর বাড়ির উঠোনের জোড়া কবর এবং মহল্লার রাস্তার মাথায় জনতার বদু মওলানার কুর্তা পোড়ানোর উৎসব। সে সময় আজিজ পাঠানের, নিজের লুণ্ঠিত বাড়িটির চেহারাও মনে পড়েছিল। কিন্তু ব্রাশের ঘায়ে মাড়ি ক্ষতবিক্ষত করে, বদু মওলানার দিকে তাকিয়ে তার মনে হয় যে, একাত্তরের মার্চের পঁচিশ তারিখের আগেও বদু মওলানা এ রকমই ছিল, বিষণ্ন ও নতমুখ এবং মহল্লার লোকেরা জেনেছিল যে, যে মঙ্গহলবার বিকেলে মোমেনার মার হাহাকার শোনা গিয়েছিল, 'থুক দেই মুখে' তার পরদিন সকালে আজিজ পাঠান ক্রন্দনরত বদু মওলানাকে বলেছিল কাইন্দেন না মওলানা, কাইন্দেন না। কিন্তু তারপর বদু মওলানা যখন সকলের সম্মুখ দিয়ে 'স্লামালেকুম' বলে হেঁটে গিয়েছিল তখন মহল্লার লোকেরা নির্বিকার থাকে, কারণ তখন তাদের অনিদ্রাপীড়িত চেতনায় মোমেনার মার আগের দিনের চিৎকার জেগেছিল, তবে তখন মহল্লার লোকের এই আচরণে বদু মওলানা আর বিচলিত হয় না। আজিজ পাঠানের বাড়িতে বদু মওলানার অশ্রুপাতের কাহিনী মহল্লায় প্রচারিত হয়ে পড়লে মহল্লার লোকেরা সে বিষয়ে তার নিজের বক্তব্য শুনতে পায়। মহল্লার লোকেরা জানতে পারে যে, বদু মওলানা এই কথা বলে যে, একমাত্র মানী লোক-ই মানীর সম্মান রাখতে জানে। বালক-বালিকাদের স্কুলের গল্পের বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সে বলে যে, বীর রাজা পুরুর মতো সে বিজয়ী আলেকজান্ডারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং সে দেখেছিল যে, আলেকজান্ডাররা সব সময় পুরুষদের সঙ্গে একই ব্যবহারই করে; কারণ একমাত্র বীরই চিনতে পারে বীরের লক্ষণ সকল। বদু মওলানার এইসব কথা মহল্লার লোকেরা বুঝতে পারে না। তাদের অনেকে পুরু রাজা কিংবা আলেকজান্ডারকে চিনতে পারে না, বুঝতে পারে না বদু মওলানার বীরত্ব কোথায়। তারা বদু মওলানার এইসব কথাবার্তা ভুলে যায়। কিন্তু আবদুল মজিদ দীর্ঘদিন পর আলেকজান্ডার আর পুরু রাজার ব্যবহারের তাৎপর্য পুনরায় উপলব্ধি করে এবং নিজেকে এক সংকটাপন্ন অবস্থায় দেখতে পায়। হরতালের পর যেদিন সব পক্ষই মহল্লার লোকদের 'ভাইসব' বলে সম্বোধন

করে ধন্যবাদ দেয় এবং যেদিন বাজারে যাওয়ার পথে আবদুল মজিদের স্যান্ডেলের ফিতে ফট্ করে ছিঁড়ে যায় তার পরদিন সে আজিজ পাঠানকে এক মুহূর্তের জন্য রাস্তায় পায়; তখন দুএকটি কথার ভেতর সে তাকে এ-ও বলে যে, বদু মওলানারা এখন তাদেরকে 'ভাইসব' বলে ডাকে এবং হরতাল করার জন্য ধন্যবাদ দেয়। এই কথা শুনে তখন আজিজ পাঠান যেন তার মর্মস্থল দেখতে পায় এবং সে বিষণ্নভাবে হেসে আবদুল মজিদের কাঁধের ওপর প্রাচীন বৃক্ষ শাখার মতো তার শিরা-ওঠা হাত রাখে। সে তাকে বাসায় নিয়ে যায় বহুদিন পর এবং তার সঙ্গে এত কথা বলে যে, আবদুল মজিদ তার প্রায় কিছুই বুঝতে পারে না, শুধুমাত্র একটি কথা ছাড়া, তা হচ্ছে এই যে, রাজনীতিতে চিরদিনের বন্ধু অথবা চিরদিনের শত্রু বলে কিছু তো নেই, কাজেই অতীত ভুলে যাওয়া ছাড়া আর কিইবা করার থাকে মানুষের। কিন্তু ক্রমাগতভাবে অতীত ভুলে যাওয়া লক্ষ্মীবাজারের লোকেরা দেখে যে, তাদের অতীত যেন অনবরত ঘাসের অঙ্কুরের মতো মাটি ভেদ করে উঠে আসে। তারা এখন এই সত্যটি ভুলে থাকে যে, মসজিদে জমায়েত হওয়ার এই অধিকারও চিরন্তন নয়; কারণ একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চ সকালে যখন তারা দেখেছিল নয়াবাজারের লাল আগুন আকাশ থেকে একটি পর্দার মতো ঝুলে আছে এবং তারা আতঙ্কিত জন্তুর মতো ভেবেছিল পালাতে হবে, সেই শুক্রবারে মসজিদে কোনো মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ ধ্বনিত হয় নাই, সেদিন কারফ্যুর ভেতর জুমার নামাজ কেউ পড়ে নাই। অবস্থা তো তখন এমন হয়েছিল যে, প্রতিদিনই তাদের মুখে আল্লাহর নাম ধ্বনিত হয়েছিল এবং তারা 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' করতে করতে মহল্লা ছেড়ে পালিয়েছিল। তারপর আবার তাড়া খাওয়া ইঁদুরের মতো সকলেই ফিরে এসেছিল মহল্লায়। তারা কে কোথায় পালাতে চেয়েছিল তা নিয়ে তাদের আলোচনা হয় নাই, তারা শুধু এই সত্যটি জেনেছিল যে, পালানোর কোনো পথ এবং স্থান ছিল না দেশে। সেই সময় তারা বদু মওলানাকে দেখেছিল হেঁটে আসতে; সে তাদেরকে বলেছিল যে, তাদের কোনো ভয় নাই, আল্লাহ মুসলমানদের রক্ষা করবেন, এবং তারপর মহল্লায় সে কাক ওড়াতে শুরু করেছিল। তারপর মহল্লায় যেদিন প্রথম পাকিস্তানি মিলিটারি আসে, বদু মওলানা সালাম দিয়ে দাঁড়ায় এবং তারা সাতজন লোককে গুলি করে মারে। পাকিস্তানি মিলিটারির ক্যাপ্টেন আয়েশ করে প্রস্রাব করে তার সৈন্যদের নিয়ে চলে যাওয়ার পর তখন সেখানে দণ্ডায়মান বদু মওলানা তার সেই স্মিত হাসিটিকে বিকশিত হতে দেয় এবং সে মহল্লার বাড়িঘরের দিকে ঘুরে তাকায়। মহল্লার লোকেরা তখন যারা তাকে দেখেছিল তাদের মনে হয় যেন কোনো ব্যাখ্যাতীত বায়ুচারিতার কারণে বদু মওলানার দেহ সম্প্রসারমাণ হয়ে ওঠে এবং মহল্লার কৃষ্ণতম দিনটিতে কাকতাড়ুয়ার মতো আকাশের দিকে মুখ করে ঝুলে থাকে। কিন্তু যখন সে শোনে যে, মহল্লার লোকেরা বলে, খাজা আহমেদ আলীর দেয়া আজান তারা শুনতে পেয়েছিল এবং তিনি তার আজান সমাপ্ত করেছিলেন, সে চিৎকার করে ওঠে এবং অন্ধকার রাতে কারফ্যুর ভেতর তার হাঁকডাক শোনা যায়। বদু মওলানা মহল্লার লোকদের বলে যে, তারা নিশ্চয়ই জানে খাজা আহমেদ আলী একজন মুনাফেক ছিল। কিন্তু মহল্লার লোকেরা এ রকম কিছু স্মরণ করতে ব্যর্থ হলে বদু মওলানা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সকালে খাজা আহমেদ আলী আর তার ছেলেকে বাড়ির উঠোনে দাফন করার সময় মহল্লার লোকেরা যখন বলে যে, খাজা আহমেদ আলী আজান সমাপ্ত করেছিলেন এবং তিনি আজানের শেষে চারবার উচ্চারণ করেছিলেন 'আল্লাহই শ্রেষ্ঠ' তখন বদু মওলানা তাদেরকে মূর্তিপূজক কাফের বলে গাল দেয় এবং বলে

AMARBOI.COM

যে, খাজা আহমেদ আলী কোনো ফেরেশতা ছিল না, সে নিশ্চিতরূপেই আজান দেয়া সমাপ্ত করে নাই। কারণ তাকে যখন ছাদের ওপর গুলি করে মারা হয় তখন সে সিঁড়ির ওপর ছিল এবং সে গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আজান বন্ধ হয়ে যেতে শুনেছিল। কিন্তু মহল্লার লোকেরা তার কথা গ্রহণ করে না, তারা বলে যে, তাদের মনে হয়েছিল একমাত্র কিন্নরকণ্ঠ বেলালের দেয়া আজানই এমন মধুর হতে পারে। তাদের এ কথা শুনে বদু মওলানা চলে যায় এবং সে যখন পুনরায় ফিরে আসে তখন লোকেরা কবরে মাটি চাপা দেয়া শেষ করে দাঁড়িয়েছে। তারা দেখে, বদু মওলানার চাকরেরা হই হই করতে করতে ভুলুর মৃতদেহ বয়ে আনে। তাদের মনে পড়ে, তারা সেদিন বদু মওলানার চোখে সাপের চেয়েও ভয়াবহ এক দৃষ্টি দেখেছিল এবং তারা তার দিকে তাকিয়ে নীরব নিশ্চল হয়ে ছিল। বদু মওলানার লোকেরা ধপাধপ করে মাটি খুঁড়ে খাজা আহমেদ আলীর বাড়ির উঠোনে, তার আর তার ছেলের কবরের পাশে কুকুরের মৃতদেহটি কবর দেয় এবং তারপর মহল্লার আতঙ্কিত লোকদের দিকে তাকিয়ে সে বলে, এই কবরে কোনো পীর নাই, কুত্তা আছে। তখন বদু মওলানার মুখের দিকে তাকিয়ে মহল্লার লোকদের মনে হয়েছিল যে, বদু মওলানাকে কিছু বলার জন্য তাদেরকে কিছুই আর কোনোদিন বলা হয় না; বরং বদু মওলানা পুনরায় তাদেরকে বলতে শুরু করে। মহল্লার লোকেরা খাজা আহমেদ আলীকে দাফন করার দিন এটা বুঝতে পেয়েছিল যে, তার প্রতি তাদের সম্মানবোধের ওপর বদু মওলানা ঘৃণিত এক কুকুরের লাশ চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু উনিশ শ আশি সনে মহল্লার লোকেরা জেনেছিল যে, এই কুকুরের মৃতদেহ বদু মওলানার কাছে প্রিয় ছিল সাতটি মানুষের লাশের চাইতে। ভিক্টোরিয়া পার্কের সভায় দাঁড়িয়ে সেদিন বদু মওলানা বলে যে, তার পুত্রের মৃত্যুর কথা বাদ দিলে একাত্তর সনে দুটো দুঃখজনক মৃত্যু সে দেখেছিল; বস্তুত সে একটি মৃত্যু দেখেছিল, সেটা ছিল তার প্রিয় পুত্রের কুকুর ভুলুর মৃত্যু। ভুলুর মৃত্যুতে সে মনে বেদনা অনুভব করেছিল। অপর মৃত্যুটি সে সংঘটিত হতে দেখে নাই; সে পরে শুনেছিল। সেটা ছিল রাজাকার আবদুল গণির মৃত্যু। বদু মওলানা অঙ্গুলিনির্দেশ করে শ্রোতাদের সেই বেঞ্চটি দেখিয়ে দেয় এবং বলে যে, যারা যখন ওই বেঞ্চের ওপর বসেছিল তারা জানে না, ওই বেঞ্চের ওপর আবদুল গণি শহীদ হয়েছিল, বদু মওলানার কথা শুনে লক্ষ্মীবাজার এবং কলতাবাজারের, পটুয়াটুলি এবং আরমানিটোলার লোকদের, যারা তার কথা শুনছিল, মনে হয়েছিল যে, সে হয়তো অন্য কোনো আবদুল গণির কথা বলছে। তাদের মনে হওয়া সত্ত্বেও, তারা বুঝতে পেরেছিল যে, এটা সেই আবদুল গণিই, যে ভিটাকোলার স্ট্র চুষতে চুষতে একুশ জন নিখোঁজ ব্যক্তিকে মৃত বলে শনাক্ত করেছিল এবং এই সব মহল্লার লোকেরা শোকার্ত মিছিল করে গিয়ে খ্রিস্টানদের কবরস্থানের পাশ থেকে খুঁড়ে তুলেছিল ছাপ্পান্নটি মাথার খুলি। কলাপাতার ওপর সাজিয়ে রাখা খুলিগুলোর দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ জনতার তখন আবদুল গণির কথা মনে পড়েছিল। তাদের শোকার্ত ক্রোধ জ্বলে উঠেছিল এবং তারা তখন খ্রিস্টানদের কবরস্থান ছেড়ে ভিক্টোরিয়া পার্কের দিকে চতুর্দিক দিয়ে ধাবিত হয়েছিল। তারা যখন ভিক্টোরিয়া পার্কে পৌছায়, তারা দেখে যে, আবদুল গণির ছিন্ন মাথা ধুলোয় পড়ে আছে। আবদুল গণিকে হত্যা করেছিল লোকেরা তা জানতে পারে না, তবে তারা বুঝতে পারে যে, আবদুল গণি যাদেরকে নিহত বলে শণাক্ত করেছিল, সেই একুশজনের যেকোনো আত্মীয় হত্যা করে থাকতে পারে; নয়াবাজারের ভস্মীভূত জনপদের যে-কেউ অথবা লক্ষ্মীবাজার, কলতাবাজার, পটুয়াটুলি, ইংলিশ রোড, নারিন্দায় ন মাস যাবৎ

মৃত্যুর মুখোমুখি বসবাসকারী যে কেউ হত্যা করে থাকতে পারে। জনতার মনে আবদুল গণির নিহত হওয়া নিয়ে কোনো বিস্ময় হয় না। তারা দড়ি খুলে আবদুল গণির ধড় বেঞ্চের ওপর থেকে একটি চাটাইয়ের ওপর নামিয়ে রাখে, রক্ত লেগে থাকা ভিটাকোলার বোতল এবং মাটিসহ খুঁড়ে তোলে। তারপর জনতা একটিন ব্লিচিং পাউডার নিয়ে আসে, আবদুল গণির রক্ত লেগে যাওয়া বেঞ্চ এবং মাটিতে পাউডার ছড়িয়ে সবকিছু পরিশুদ্ধ করে। লক্ষ্মীবাজারের মানুষদের তখন বদু মওলানার ছোট ছেলের মৃত কুকুরের কথা মনে পড়ে। তারা মহল্লায় খাজা আহমেদ আলী আর খাজা শফিকের কবরের কাছে ছুটে যায়, অতি সন্তর্পণে কুকুরের প্রোথিত কঙ্কালের সঠিক স্থান নির্ধারণ করে এবং খুব আস্তে ও যত্নের সঙ্গে বদু মওলানার পরিবারের মৃত কুকুরের চাপা দেওয়া দেহাবশেষের ওপর থেকে মাটি সরায়। তারা কুকুরের হাড়গুলো এমনভাবে মাটি থেকে আলাদা করে, যেন মাটি এবং সেই মাটিতে শায়িত খাজা আহমেদ আলী এবং খাজা শফিক টের না পায়, তারা কি করে। কুকুরের হাড়গুলো লক্ষ্মীবাজারের মানুষ একটি চটের ব্যাগে পুরে ভিক্টোরিয়া পার্কে নিয়ে যায়। সেখানে তারা আবদুল গণির দ্বিখণ্ডিত দেহ এবং রক্ত মাখানো মাটি আর ভুলুর কঙ্কাল একত্রিত করে এবং বুড়িগঙ্গা নদীর মাঝখানে নিয়ে গিয়ে পানিতে ফেলে দেয়। তারপর তারা এ দুটো প্রাণীর কথা ভুলে যায়। এর ন বছর পর বদু মওলানার মুখে আবদুল গণির কথা শুনে মানুষের চোখে পুনরায় সব ভেসে ওঠে, তারা ব্লিচিং পাউডারের গন্ধ পায়। তারা দেখে, পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি লম্বা আর একশ পাউন্ড ওজনের আবদুল গণি অন্য পাঁচজন রাজাকারের সঙ্গে মহল্লার রাস্তায় কুচকাওয়াজ করে। মহল্লার লোকেরা, তাদের ভয় সত্ত্বেও, রাস্তায় এই ছয় কাকতাড়ুয়াকে লেফটরাইট করতে দেখে যেন আমোদিত হয়েছিল। তাদের মনে হয়েছিল যে, তারা নির্ঘাত কোনো সার্কাস দেখছে; দড়ি দিয়ে বাঁধা প্যান্ট, ক্যানভাসের ঢিলে জুতো আর তোবড়ানো ক্যাপ পরা যেন ছয় জন সঙ্। তখন, মাসের পঁচিশ তারিখের পর মহল্লায় যে নির্জনতা নেমেছিল তাতে চারজোড়া ঘুঘু এসে মহল্লায় বাসা বেঁধেছিল। দুপুরবেলা যখন লোকেরা ঘরের ভেতর লুকিয়ে থাকত তখন বাড়ির কার্নিশের ওপর বসে ঘুঘু ডাকত আর লোকেরা শুনতে পেত তাদের রাস্তা দিয়ে 'লেপ্ট, লেপ্ট' করতে করতে রাজাকারদের চলে যেতে। সেই সময়, প্রাণ যখন ম্রিয়মাণ ছিল ভয়ে, এদের দেখে মহল্লার নারীদের অর্বাচীনের মতো হাসি পেয়েছিল। তাদের মনে হয়েছিল যেন এক সারি ডায়া হেঁটে যায়। কেমুন লাল পিঁপড়ার লাহান লাগে একেকটারে, তারা বলেছিল। মহল্লার লোকেরা বুঝতে পারে না রাজাকাররা তাদের রমণী এবং শিশুদের এই কৌতুকের কথা শুনেছিল কি না, তবে মনে হয় যেন রাজাকাররা মহল্লায় তাদের জীবন কৌতুক দিয়েই শুরু করে। মহল্লায় তাদের প্রথম দেখা যাওয়ার তিন দিন পর তারা প্যারেড করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং আব্বাস আলীর দরজায় এসে টোকা দেয় তেষ্টা নিবারণের জন্য, তারপর দরজা খুলতে দেরি হওয়ায় দরজায় লাথি মারে তিনবার। তখন দরজা খুলে ছ ফুট লম্বা আব্বাস আলী এগিয়ে এলে তারা তার নাম জিজ্ঞেস করে। মহল্লার লোকেরা পরে শোনে যে, আব্বাস আলী তার নাম বললে ছজন রাজাকার মুখ ভেঙিয়ে বলেছিল যে, তার নাম আব্বাস আলী নয়, গাবগাছ আলী। তারপর দরজা খোলার বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে যখন তোৎলায় তখন একজন রাজাকার লাঠি দিয়ে বিশালদেহী আব্বাসের পাঁজরে আঘাত করে এবং বলে, তুই ব্যাটা গাবগাছ আলী, তরে পিটায়া লাশ বানামু। তবে মহল্লার লোকেরা যখন আব্বাস আলীর পাঁজরে আঘাতের কালো

হয়ে যাওয়া দাগ দেখে তারা বুঝতে পারে যে, এর ভেতর কোনো কৌতুক ছিল না। এরপর সঙের মতো দেখতে রাজাকার প্রাইমারি স্কুলে কসাইখানা বসায় এবং এই কসাইখানার কর্মকাণ্ডের বিশদ হিসাব মহল্লার লোকেরা জানতে পারে ভিক্টোরিয়া পার্কে আবদুল গণির পাছার ভেতর বন্দুকের নল ঢুকিয়ে দেয়ার পর। এর ন বছর পর বদু মওলানা তাদের বলে যে, আবদুল গণি কুকুরের মতো জনতার ক্রোধের কারণে নিহত হয়েছিল– সে শহীদ হয়েছিল আসলে। মহল্লার লোকদের এ ব্যাপারে যদিও বিভ্রান্তি হয় না, তবু তারা অনুধাবন করতে পারে যে, সময়ের সঙ্গে সত্য বদলে যায়। মহল্লার লোকের মনে হয় যে, প্রকৃতি অথবা ভাগ্য বোধ হয় ছজন রাজাকারের ভেতর কোনো কারণে আবদুল গণিকে বাছাই করে নিয়েছিল। ছজনের ভেতর একমাত্র সে-ই ধরা পড়েছিল যুদ্ধের পর, তার কারণেই এক বর্ষার দিনে সব ভয়ের ভেতরও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল মহল্লার লোক এবং তারপর মহল্লায় দ্বিতীয় দিনের মতো মিলিটারি এসেছিল। শ্রাবণের শেষ দিকে একদিন রাস্তায় হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলে আবদুল গণি দ্রুত মায়ারাণীদের পরিত্যক্ত বাড়ির ফটকের নিচে আশ্রয় নিয়েছিল। সে ভেবেছিল, বৃষ্টি শিগগিরই থেমে যাবে, কিন্তু অঝোর ধারায় বৃষ্টি দীর্ঘক্ষণ ধরে পড়তে থাকলে সে বিরক্ত এবং কাঁধে ঝোলানো থ্রি নট থ্রি রাইফেলের ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সে রাইফেল নামিয়ে রাখে না, তবে দেখে, খোলা ফটকের পাশে একটি তুলসী গাছ বৃষ্টির পানিতে ভিজে ঢলোমলো করে। আবদুল গণি অনেকটা বিরক্তি এড়ানোর জন্য প্রথমে তুলসীর দুএকটি পাতা ছিঁড়ে চিবোয়, তারপর সে গাছের একটি ডাল ভেঙে নেয়। মহল্লার লোকেরা এই কাহিনী পরে জানতে পারে। তারা জানতে পারে যে, মায়ারাণীদের তুলসী গাছের ডাল ভাঙার পর বৃষ্টির দিনের সেই ঘটনার শুরু হয়েছিল। মায়ারাণীকে মহল্লার লোকেরা এখনো দেখে, বনগ্রামের প্রাইমারি স্কুলে সে এখন শিক্ষকতা করে এবং এখনো অনূঢ়া। মহল্লার লোকেরা বলে যে, মায়ারাণী মোহাম্মদ সেলিমের প্রতীক্ষায় তার জীবন নিয়োজিত করেছে। কিন্তু আবদুল মজিদের মনে হয়েছিল যে, মায়ারাণী মোহাম্মদ সেলিমের প্রতীক্ষায় নাই, তবে সে কেন বিয়ে করে না তা আবদুল মজিদ বুঝতে পারে না। বাহাত্তর সনে যখন অন্যান্য হিন্দুদের সঙ্গে মহল্লায় মায়ারাণীরা ফিরে আসে কিন্তু মোহাম্মদ সেলিম ফেরে না এবং তার তোরঙ্গের ভেতর মায়ারাণীর একটি চিরকুট পাওয়া যায়, তখন আবদুল মজিদের তাদের দেয়ালের ফোকরে রাখা একুশটি চিঠির কথা মনে পড়ে। সে ফোকরের মুখের ইট খসিয়ে ধুলো জমা কাগজগুলো বের করে পুনরায় অতীতের সেই বিপদগ্রস্ততায় ফিরে গিয়েছিল, যখন, সে চিঠিগুলো গ্রহণে মায়ারাণীকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে নাই অথচ সেগুলো মোহাম্মদ সেলিমকে ফিরিয়ে দিতেও পারে নাই। নিখোঁজ মোহাম্মদ সেলিমের চিঠিগুলো পুনরায় দেখে আবদুল মজিদের অপরাধবোধ হয়েছিল এবং একবার ভেবেছিল চিঠিগুলো মোহাম্মদ সেলিমের মার কাছে ফিরিয়ে দেবে, খুলে বলবে মায়ারাণীর চিরকুটের গোপন রহস্যের কথা। কিন্তু তা সে করতে পারে না, তার মনে হয় এই মিথ্যেটি এখন সত্যের চাইতে অধিক বিশ্বাসযোগ্য হয়ে গেছে এবং মোহাম্মদ সেলিমের মৃত্যুর ফলে বিষয়টি ইতিমধ্যেই অর্থহীন হয়ে গেছে; বিষয়টির নতুন করে অবতারণার কোনো মানে হয় না। ফলে মোহাম্মদ সেলিমের একুশটি নিষ্ফল চিঠি আবদুল মজিদদের ঘরের দেয়ালের ফোকরে আরো এক যুগের বেশি বন্দি হয়ে থাকে। তারপর একদিন, যেদিন রায়সাবাজার যাওয়ার পথে মওলানার কথা শুনে তার স্পঞ্জের স্যান্ডেলের ফিতে ছিঁড়ে যায় তার ছমাস পর, এক রবিবারের সকালে ইয়াসমিন

AMARBOI.COM

একটি কন্যাসন্তান প্রসব করলে আবদুল মজিদ তার নাম রাখে মোমেনা এবং সেদিন বিকেলে পড়ন্ত রোদের মতো ম্লান-অনূঢ়া মায়ারাণী যখন আবদুল মজিদের নবজাতক মেয়েকে দেখতে আসে, তার পুনরায় মোহাম্মদ সেলিমের কথা মনে পড়ে। সে কালো এবং বিষণ্ন মায়ারাণীর মুখের দিকে তাকায় কিন্তু সে এখনো তাকে বুঝতে পারে না। তারপর মায়ারাণী যখন ইয়াসমিনের শয্যাপাশ ত্যাগ করে বাইরের ঘরে আসে, তখন আবদুল মজিদের মনে হয়, আর একবার সে চেষ্টা করে দেখতে পারে। সে মায়ারাণীকে বাইরের ঘরে বসায়। তারপর সে একটি চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে সেই প্রাচীন ফোকরের ভেতর থেকে মলিন কাগজের টুকরোগুলো বের করে বলে, এগুলি লয়া যান। আবদুল মজিদ বিস্ময়াবিষ্ট হয়, যখন, সে একুশটি চিঠি মায়ারাণীর দিকে এগিয়ে ধরে এবং মায়ারাণী একদণ্ড চুপ করে তাকিয়ে থেকে দুহাতের করতল পেতে চিঠিগুলো নেয়। আঁচলের খুঁটে একথোকা বাসী শেফালি ফুলের মতো মোহাম্মদ সেলিমের একুশটি প্রেমপত্র বেঁধে নিয়ে মায়ারাণী যখন একটিও কথা না বলে নিষ্ক্রান্ত হয়, তখন প্রথমে আবদুল মজিদের মনে হয় যে, এতদিনে সে লাড্ডু বিস্কুট খাওয়ার ঋণ থেকে মুক্তি পেল। তারপর, মোহাম্মদ সেলিমের জন্যও তার হৃদয় উদ্বেলিত হয়; তার মনে হয় মোহাম্মদ সেলিমের সবকিছুই অবশেষে সফল হলো, সে যুদ্ধে গিয়ে দেশ মুক্ত করল এবং দীর্ঘ অবহেলা শেষে মায়ারাণী গ্রহণ করল তার প্রেম। কিন্তু মোহাম্মদ সেলিমের প্রেমের পুনর্বাসন সম্পর্কে আবদুল মজিদের এই ধারণা একদিন পরেই সংশয়কবলিত হয়। তার ভেতর এক ধরনের বিভ্রান্তি দেখা দেয়, যখন পরের দিন অপরাহ্নে মায়ারাণী তাকে ডেকে নিয়ে যায় এবং তাকে উঠোনে বসিয়ে রেখে তার চোখের সামনে কতিপয় কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে। আবদুল মজিদকে উঠোনোর ধারে বারান্দায় বসিয়ে মায়ারাণী একটি মরচে ধরা দা দিয়ে ফটকের কাছে বেদির ওপর লাগানো বড় তুলসী গাছটি গোড়া থেকে কেটে দূরে নিয়ে ফেলে দিয়ে আসে, তারপর সে বেদির মাটি খুঁড়ে শিকড়সহ গোড়াটাও তুলে ফেলে দেয়। আবদুল মজিদের মনে পড়ে, তুলসী গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে একাত্তর সনে শ্রাবণের এক বৃষ্টির দিনে মহল্লায় এক বিদ্রোহ ঘটে যায়। রাজাকার আবদুল গণি বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মায়ারাণীদের ফটকের নিচে আশ্রয় নিয়ে তুলসীর ডাল ভেঙে পাতা চিবুচ্ছিল। তারপর বৃষ্টি ধরে এলে সে যখন তুলসীর ডাল হাতে নিয়ে বদু মওলানার বাড়িতে যায় এবং বারান্দায় বদু মওলানার মুখোমুখি হয়, তার দিকে তাকিয়ে বদু মওলানার ভ্রূ কুঁচকে যায়, কি খাও! বদু মওলানার এটা প্রশ্ন ছিল না, তিরস্কার ছিল; কারণ তুলসী পাতা বদু মওলানার অপরিচিত ছিল না। কিন্তু আবদুল গণি না বুঝে তার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল, তুলসী পাতা খাই। এই কথা শুনে বদু মওলানা ক্ষেপে গিয়েছিল, কিন্তু তার পরেও সে নিজেকে ধরে রেখে বলেছিল, তুলসী পাতা খাও কেন! নির্বোধ আবদুল গণি এরপরও তার কথা বুঝতে পারে নাই, সে পুনরায় মনে করে যে, এটা আর একটা প্রশ্ন এবং বলে যে, তুলসীর পাতা চিবোতে ভালো লাগে। তখন বদু মওলানা 'নাদান' বলে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে এবং তুলসীর ডালটি কেড়ে নিয়ে উঠোনে ছুড়ে ফেলে দেয়। সে বলে যে, তুলসী গাছ হিন্দুরা পূজা করে, এই গাছ হিন্দু গাছ। তখন বদু মওলানার একটি কথা মনে পড়ে যে, লক্ষ্মীবাজার এলাকা এই গাছ দিয়ে ভরে গেছে, সে জানে মহল্লার প্রতিটি বাড়িতে তুলসী গাছ আছে। তার মনে হয়, গাছ হিসেবে তুলসী অপ্রয়োজনীয় এবং আত্মার জন্য ক্ষতিকর। সে আধ ঘণ্টার ভেতর তার আঙিনায় ছজন রাজাকারকে সমবেত করে তুলসী গাছ সম্পর্কে তার বক্তব্য শোনায় এবং তারপর

AMARBOI.COM

তাদেরকে অনতিবিলম্বে মহল্লার সব তুলসী গাছ কেটে ফেলতে বলে। এই নির্দেশের ফলে মহল্লায় প্রথম মিলিটারি আসার পর এবার রাজাকাররা প্রতিটি বাড়ির প্রাঙ্গণ, কুয়োতলা এবং গলি দিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে শুরু করে। তারা হিন্দু এবং মুসলমানদের প্রতিটি বাড়ি থেকে সব তুলসী গাছ টেনে উপড়ে অথবা গোড়া থেকে ভেঙে এনে রাস্তার ওপর এক জায়গায় ফেলে। এভাবে তুলসী গাছ কাটতে গিয়ে ব্যাপারটি জটিল হয়ে ওঠে যখন সকলের শেষে একজন রাজাকার আবদুল মজিদদের বাসায় ঢুকে পেছনের আঙিনায় কুয়োতলার কাছ থেকে একটি বড় আর দুটো ছোট গাছ উপড়ে নিয়ে আসার সময় দেখে, রক্তের মতো লাল হয়ে জবাফুল ফুটে আছে। এই রাজাকারটির তখন মনে হয় যে, জবাফুল দিয়ে হিন্দুরা পূজা করে এবং তুলসীর মতো জবা ফুলগাছও হিন্দু গাছ এবং অপ্রয়োজনীয়। সে তখন ঝাঁকড়া জবাগাছটি গোড়া থেকে ভাঙার চেষ্টা করে, না পেরে ডাল ভাঙতে থাকে। এই অবস্থায় তাকে আবদুল মজিদের বোন মোমেনা দেখতে পায় এবং সে তার সহ্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। মহল্লার লোকেরা পরে জানতে পারে যে, মোমেনা জবাফুল গাছ ভাঙায় বাধা দিলে রাজাকারটি তার কথায় কর্ণপাত করতে চায় না, তখন এই মেয়েটি রান্নাঘর থেকে কাটারি নিয়ে এসে অনুপ্রবেশকারীকে তাড়া করে বের করে দেয়। মহল্লার লোকেরা একটু পরেই সব জানতে পারে, কারণ, একটু পরেই তারা বিষয়টির সঙ্গে জড়িত হয়। তাড়া খাওয়া রাজাকারটি ঘটনার সময় নিরস্ত্র থাকায় ভয় পেলেও অন্যদের সঙ্গে মিলিত হওয়া মাত্র তার সাহস ফিরে আসে এবং আহত পৌরুষ জাগ্রত হয়। সে তার সঙ্গীদের সব ফুল গাছ কেটে ফেলার প্ররোচনা দেয় এবং মহল্লার লোকেরা দেখে, রাজাকাররা আবার তাদের বাড়ির ভেতর প্রবেশ করতে উদ্যত হয়। এতে তারা আপত্তি করে এবং এর ফলে প্রথমে রাজাকারদের সঙ্গে তাদের বচসা হয়, তারপর সব লোক জড়ো হয়ে গেলে এবং রাজাকাররা পুনরায় গৃহে প্রবেশের জন্য জোর করলে ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে একজন বিচ্ছিন্ন রাজাকারকে একজন চপেটাঘাত করে। ঘটনাটি খুবই আকস্মিকভাবে ঘটে যায়, যে রাজাকারটি চড় খায় সে হঠাৎ করে বুঝে উঠতে পারে না কে তাকে চড় মেরেছে, কারণ, সে তখন অন্যদিকে তাকিয়েছিল। অন্যদিকে মহল্লার লোকেরা এই লোকটিকে শনাক্ত করতে অস্বীকার করে, তারা বলে যে, তারা চপেটাঘাত করতে দেখেনি। তবে মহল্লার লোকেরা এক মুহূর্তের ভেতর ঘটনার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হয়। তারা এক প্রবল ভয়ের অনুভব নিয়ে দ্রুত যার যার বাড়ির ভিতর অপসৃত হয়। রাস্তার ওপর ছজন রাজাকার প্রথমে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর আক্রান্ত রাজাকারটির চৈতন্য যেন প্রথম ফিরে আসে। সে শূন্য রাস্তা আর বাড়িগুলোর বন্ধ ফটকের দিকে তাকিয়ে গর্জন করে ওঠে, মান্দার পোলারা! তারপর তারা সব বন্ধ ফটকের দিকে দৌড়ে যায় এবং দমাদম করে লাথি মারতে থাকে, উন্মত্ততার এই পর্যায়ে চড় খাওয়া রাজাকারটি থ্রি নট থ্রি রাইফেল বাগিয়ে ধরে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে; রাইফেলের গুলি লেগে বাড়ির কার্নিশের পলেস্তারা খসে পড়ে, দরজা ফুটো হয়ে যায়। মহল্লার লোকেরা পরে জানতে পারে যে, গুলির শব্দ শুনে বদু মওলানা প্রথমে ভয় পেয়ে যায়, তারপর যখন সে জানতে পারে যে, তার রাজাকাররা ক্ষেপে গেছে, সে এগিয়ে এসে সব দেখে এবং তারা একটু শান্ত হয়ে এলে সব বৃত্তান্ত শোনে। বদু মওলানা যখন শোনে যে, একজন রাজাকারকে চড় মারা হয়েছে, সে খুব বিচলিত হয়ে পড়ে। এই সময় গুলির শব্দ থেমে গেলে মহল্লার দু-একজন, যারা সাহস করে রাস্তায় উঁকি দেয় তারা দেখে, বদু

মওলানার পেছনে রাজাকারদের মার্চ করে যেতে। সেই দিন আর কিছুক্ষণ পরে মহল্লায় দ্বিতীয়বারের মতো মিলিটারি আসে এবং মহল্লার লোকেরা এক অবিস্মরণীয় ঘটনা সংঘটিত হতে দেখে। এই বিষয়টি পরে জানা গিয়েছিল যে, বদু মওলানা রাজাকারদের কাছ থেকে সব শুনে বিচলিত হয়ে পড়ে এই কারণে যে, সে পুরো জিনিসটার ভেতর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া সাহসের এক পুনরুত্থানের ইঙ্গিত যেন দেখতে পায়। তার মনে হয়, মহল্লার লোকদের আর একবার মিলিটারি দেখানো প্রয়োজন। তার দেয়া খবর পেয়ে একটু পরে গুম গুম শব্দ করে মিলিটারি বোঝাই একটি ট্রাক মহল্লার চাপা রাস্তার ওপর ফেলে রাখা তুলসী গাছের স্তূপের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তখন মহল্লার লোকদের যে অনুভূতি হয়েছিল সেটা এই অবস্থায় সব প্রাণীরই হয়, তা হলো ছুটে পালানো। কিন্তু লক্ষ্মীবাজারের লোকদের অতীতের সেই উপলব্ধির কথাটি মনে পড়ে যে, দেশে পালানোর স্থান নেই এবং এবার তারা পলায়নের প্রবল ইচ্ছে অবদমিত করে যার যার বাড়িতে থেকে যায়। পরে এই বিষয়টি জানা গিয়েছিল যে, মিলিটারির আগমন সংবাদ পেয়ে বদু মওলানা মিলিটারির এই দলটির নেতা, এক মাকরানি লেফটেন্যান্টকে অভ্যর্থনা করে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসায়। বদু মওলানা তখন তাকে মহল্লায় সংঘটিত অভ্যুত্থানের ঘটনা সম্পর্কে বলে। কালো কুচকুচে অল্প বয়সী লেফটেন্যান্ট প্রশ্ন করে ঘটনার প্রতিটি স্তর উন্মোচিত করে বলে ওঠে, কেয়া আপ আওরাতকা সাথ নেহি সাকতা? বদু মওলানা তার এই কথায় খুবই বিব্রতবোধ করে এবং বলে যে, যদিও এই উত্থানের সূত্রপাত করেছিল একজন স্ত্রীলোক, পরিণতিতে মহল্লার সব পুরুষ এতে অংশ নেয় এবং একজন পুরুষই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী রাজাকারকে চপেটাঘাত করার দুঃসাহস দেখায়। তখন মাকরানি লেফটেন্যান্ট মহল্লায় একটি অপারেশন করার বিষয়ে বদু মওলানার সঙ্গে একমত হলেও সে তার চাপল্য ত্যাগ করতে ব্যর্থ হয় এবং বলে, লেটস সি দি হেরোইন ফার্স্ট। বদু মওলানা, হিরোইনটি কে তা বুঝতে সক্ষম হলেও, ইংরেজি এই বাক্যের পুরো অর্থ বুঝতে পারে না; তখন লেফটেন্যান্ট তাকে উর্দুতে তার ইচ্ছের কথা বুঝিয়ে দেয় এবং বদু মওলানা দুজন রাজাকারকে পাঠায় মোমেনাকে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু রাজাকাররা মোমেনাকে বাসায় পায় না মহল্লার লোকেরা কেউ তাকে বাড়ি ত্যাগ করে যেতে দেখে নাই, কিন্তু তার মা বলে যে, সে কুমিল্লায় তার খালার বাড়ি বেড়াতে গেছে এই একটু আগে। রাজাকাররা আবদুল মজিদের মার এই কথা শুনে রাগে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে থাকে। তাদের কোনো সন্দেহ-ই থাকে না যে, স্ত্রীলোকটি মিথ্যে বলছে, কিন্তু বাড়ির ভেতরটায় খুঁজে তছনছ করেও তারা মোমেনাকে দেখতে পায় না। এই সময় মহল্লার লোকেরা, যারা জানালা অথবা দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয়, রাস্তার ওপর সেই অবিস্মরণীয় দৃশ্যটি উন্মোচিত হতে দেখে। তারা দেখে, ট্রাকের ওপর থেকে কয়েকজন মিলিটারি সিপাই রাস্তার ওপর লাফিয়ে নামে, তাদের হাতে চাইনিজ অটোমেটিক রাইফেল। তারা প্রথমে রাস্তায় অল্প অল্প পায়চারি করে, তারপর দুজন গিয়ে ওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ায় এবং পেশাব করে। সেই সময় একজন সিপাই একটি তুলসীর ডাল তুলে নিয়ে পাতা ছিঁড়ে রাস্তার ওপর ফেলতে থাকে। এটা মহল্লার লোকেরা বুঝতে পারে যে, সময় কাটানোর জন্য সে এই কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু এটা করতে গিয়ে সে তুলসরি প্রভাবের কবলিত হয়। পাতা টেনে ছেঁড়ার সময় সে প্রথমে এর ব্যতিক্রমী ঘ্রাণটি পায় এবং সে তখন একটি সবুজাভ বেগুনি রঙের পাতা প্রথমে একটু সামনের দাঁতে কেটে তারপর মুখের ভেতর স্থাপন করে। তখন, ক্যান্টনমেন্টের রুটি আর

AMARBOI.COM

কাবাব খাওয়ার একঘেয়ে অভিজ্ঞতা এবং যুদ্ধের উত্তেজনায় অবসাদগ্রস্ত তার জিহ্বাটি এক মুহূর্তে ঝাঁঝালো রসের ঝাঁকুনি খেয়ে জেগে ওঠে। এ সময় রাজাকাররা কুচকাওয়াজ করে ফিরে আসে, তারা তুলসীপাতা ভক্ষণরত সিপাইদের দিকে না তাকিয়ে ভেতরে গিয়ে তাদের ব্যর্থতার খবর দেয়। রাজাকারদের এই ব্যর্থতায় তরুণ লেফটেন্যান্টের অপারেশন পরিচালনা করার ইচ্ছে সবল হয়। বদু মওলানাকে সঙ্গে করে সে যখন বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ায় তখন সে দেখে, তার সিপাইরা গুল্মের একটি স্তূপকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের কাঁধে রাইফেল হাতে তুলসীর ডাল; প্রত্যেকে পাতা চিবোচ্ছে। সে এবং বদু মওলানা দেখে যে, লোকগুলো তুলসীর সব পাতা প্রায় খেয়ে ফেলেছে, তাদের সামনে পড়ে আছে পাতাহীন গুল্মের কঙ্কালের স্তূপ। এই দৃশ্য দেখে বদু মওলানা স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। এবং লেফটেন্যান্ট বিচলিত হয়। যখন বদু মওলানা তাদেরকে বলে যে, এ তারা কি করছে, তারা উত্তর দেয়, ইয়ে এলাজ হায়। তখন হতাশ বদু মওলানা লেফটেন্যান্টের দিকে ফিরে বলে যে, এই লোকগুলোর আত্মা কলুষিত হয়ে গেছে। তার এই কথা শুনে লেফটেন্যান্টের মনে হয়, সিপাইগুলো যেভাবে ধুলোবালি-মাখা আধমণ পাতা খেয়েছে তাতে খুব শিগগিরই তাদের পেটে বিষক্রিয়া হবে। তার মনে হতে থাকে এ-ও হয়তো মুক্তিযোদ্ধাদের পেতে রাখা একটি ফাঁদ ছিল। এই অবস্থায় মহল্লায় অপারেশন স্থগিত হয় এবং দ্রুত চিকিৎসার জন্য লেফটেন্যান্ট সিপাইদের নিয়ে মহল্লা ত্যাগ করে। এর পনেরো বছর পর নির্জন এক অপরাহ্নে মায়ারাণী যখন আবদুল মজিদকে সামনে বসিয়ে রেখে ফটকের কাছে বেদির মাটিতে বড় হয়ে ওঠা তাদের তুলসী গাছটি শেকড়সহ খুঁড়ে তুলে ফেলে দেয় সে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে থাকে। সে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে না, কারণ, মায়ারাণীর সঙ্গে তার কখনোই বেশি কথা বলার সম্পর্ক ছিল না, তাছাড়া তার মনে হয় যে, মায়ারাণী এইসব অলৌকিক কর্মকাণ্ডের ব্যস্ততার ভেতর তার সঙ্গে এখন কথা বলবে না। সে দেখে, গাছ কেটে এবং শেকড় উপড়ে ফেলে দেয়ার পর মায়ারাণী একটি কচি তুলসী গাছের চারা, কাঁসার ঘড়ায় করে পানি, গোলাপি কাপড়ে বাঁধা একটি ছোট পুঁটুলি এবং তেলের প্রদীপ এনে উঠোনে রাখে। তারপর মায়ারাণী যখন পায়ের পাতার ওপর বসে পুঁটুলিটি খোলে, আবদুল মজিদ সেই একুশটি পত্র দেখতে পায়। আবদুল মজিদের মনে হয় যেন মায়ারাণী কোনো এক বিস্ময়কর যজ্ঞ সম্পাদন করে চলে; সে দিয়াশলাইয়ের কাঠি ঠুকে প্রদীপের সলতেয় আগুন জ্বালে, তারপর মোহাম্মদ সেলিমের একুশটি বিষণ্ন চিঠি একে একে পুড়িয়ে ছাই করে সে ছাই বেদির মাটিতে প্রয়োগ করে। এই ঘটনায় আবদুল মজিদের দুঃখবোধ হলেও সে অপেক্ষা করে এবং দেখে যে, বেদির মাটির সঙ্গে কাগজ-পোড়া ছাই মেশানোর পর মায়ারাণী তরুণ তুলসী গাছটি তুলে নিয়ে যত্নের সঙ্গে সেই মাটিতে রোপণ করে। তারপর গোড়ায় একটি কাঠি পুঁতে ঘড়া থেকে জল ঢেলে দেয়। এই পর্যায়ে এসে আবদুল মজিদের হতাশা এবং দুঃখবোধ এক ধরনের বিভ্রান্তিতে রূপ নেয় এবং তার মনে হয় যে, তার এই বিভ্রান্তির সমাধান কোনো দিনই হবে না; কারণ মায়ারাণী কোনোদিনই তাকে পরিষ্কার করে বলবে না, সে যা করেছিল তা কেন করেছিল। মায়ারাণী শুধু তার অন্য প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছিল, যে প্রশ্নটি তার মনের ভেতরে ছিল কিন্তু সে উচ্চারণ করে নাই, এই বলে যে, তাকে ডেকে এনে এসব দেখানোর উদ্দেশ্যে ছিল এই, যাতে সে জানে চিঠিগুলোর অস্তিত্ব লুপ্ত হয়েছে। মায়ারাণীর এই কাণ্ড দেখে ঘরে ফিরে আসার পর আবদুল মজিদের মনে দীর্ঘদিন পূর্বে মৃত এবং বিস্তৃত মোহাম্মদ সেলিমের প্রেমের সাফল্য এবং ব্যর্থতাবিষয়ক তার

বিভ্রান্তি জেগে থাকে। এই সময় তার মা একটি কাঁথায় জড়িয়ে তার সদ্যোজাত কন্যাটিকে তার কোলে যখন দেয়, সে দেখে, একটি খয়েরি রঙের নরম কাপড়ের মতো তার মেয়ের ছোট্ট মুখ; তার মনে হয়, তার কন্যাটিও কালো হবে তার মা এবং মোমেনার মতো। মোমেনার কথা আবার যখন তার স্মৃতিতে স্পষ্টভাবে এসে পড়ে এবং যখন সদ্যোজাত মেয়ে সন্তানটির নামকরণ নিয়ে তার নানি এবং দাদি, মা এবং খালা অচিরেই তৎপরতা শুরু করে তখন আবদুল মজিদ তার কন্যাটিকে দুহাতে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে বলে যে, এই কন্যাটির নাম 'মোমেনা' রাখা হোক। তার কথা শুনে সকলে স্তব্ধ হয়ে যায়। তার বৃদ্ধা মা নিমজ্জিত হয় তার নিজের প্রথম কন্যার আগমন এবং তিরোধানের ঘটনার আনন্দ এবং বেদনার স্মৃতি উদঘাটনে, অন্যরা বুঝতে পারে যে, এই নামটি এই পরিবারের লোকদের আবেগ এবং অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। আবদুল মজিদের মেয়ের নাম 'মোমেনা' রাখা হয়ে যায়। ছোট মোমেনার অস্তিত্বের ভেতর বড় মোমেনার অস্তিত্ব যে ফিরে আসে, এ ব্যাপারে আবদুল মজিদের কোনো সন্দেহ থাকে না– যে বেড় মোমেনাকে তারা বাঁচাতে ব্যর্থ হয়েছিল। জবা ফুল গাছ নিয়ে মহল্লায় খণ্ড যুদ্ধের পর যখন রাজাকাররা আবদুল মজিদদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিল মোমেনার খোঁজে তখন সে কুয়োতলার পেছনে একটি পরিত্যক্ত এবং ভগ্ন কুঠরির মেঝের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল, তার দেহ ছাই এবং মাটি দিয়ে পরিপূর্ণভাবে ঢেকে দেয়া ছিল, কেবলমাত্র পেঁপে পাতার ডাঁটার তিনটে নল তার নাকের সঙ্গে বাইরের আবহাওয়ার সংযোগ সাধন করেছিল এবং এই আস্তরণের ওপর একটি মুরগি সাতটি ডিমের ওপর বসে তা দিচ্ছিল। রাজাকাররা এসে সারা বাড়ি খুঁজে মোমেনাকে পায় না, তার মা তাদের বলে যে, সে তার খালার বাড়ি বেড়াতে গেছে। সে দিন মোমেনা মাটি এবং ছাইয়ের নিচে চাপা দেয়া অবস্থায় পড়ে ছিল। পরে সে বলেছিল যে, সে এই সময়টা ঘুমিয়ে ছিল, রাত গভীর হলে আবদুল মজিদ কোদাল দিয়ে কেটে তার ওপর থেকে মাটি সরানোর পর তার ঘুম ভাঙে। এই কবরের ভেতর থেকে বের হয়ে এসে মোমেনা আশ্রয় নেয় তাদের মধ্যের ঘরের চৌকির তলায়। মহল্লার লোকেরা এরপর আর মোমেনাকে দেখে নাই, তারা জেনেছিল যে, সে কুমিল্লা গেছে এবং ডিসেম্বরের দশ তারিখে, ঢাকার ওপর যখন উড়োজাহাজ বোমা ফেলছিল এবং দেশ যে কোনো মুহূর্তে মুক্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল, তখন তারা জানতে পারে যে, মোমেনা তাদের বাসাতেই ছিল এবং রাজাকাররা তাকে ধরে নিয়ে গেছে। মহল্লার লোকেরা জানতে পারে যে, মোমেনা চৌকির নিচে লুকিয়ে ছিল এবং রাত ছাড়া বের হতো না; তা সত্ত্বেও, রাজাকাররা খবর পেয়ে যায় এবং দশ তারিখের কারফ্যুর ভেতর এসে আবদুল মজিদদের প্রাঙ্গণে দাঁড়ায়। এবার আবদুল মজিদের মা, তার মেয়ে কুমিল্লায় থাকে বললে তারা হাসে এবং ঘরে ঢুকে চৌকির তল থেকে মোমেনাকে টেনে বের করে। সে সময়, আবদুল মজিদ এসে যখন তার বোনের হাত ধরে, একজন রাজাকার তার পেটের ওপর বন্দুকের নল চেপে ধরে এবং মোমেনা তখন বলে, ডরাইস না, আমারে কিছু করব না। এই কথা বলে একাত্তর সনের ডিসেম্বরের দশ তারিখে দুপুরের পর মোমেনা আবদুল মজিদের হাতের বাঁধন খুলে রাজাকারদের সঙ্গে চলে যায়; সে আর ফেরে নাই। তখন আবদুল মজিদ আর তার মা বদু মওলানার বাড়িতে ছুটে গিয়েছিল, বদু মওলানার পায়ের ওপর তার মা পড়ে ছিল, লোকে যেমন আল্লাহর উদ্দেশে সেজদায় পড়ে থাকে। আবদুল মজিদ দেখেছিল, আধোচৈতন্যের ভেতর অবস্থানকারী তার মায়ের

AMARBOI.COM

মুখের ফেনায় বদু মওলানার পাম্প শু ভিজে যাচ্ছিল। বাড়ির ছাদের ওপর এবং ফটকের কাছে বালুর বস্তার পেছনে পাহারারত রাজাকার নিয়ে, এই কোণঠাসা অবস্থাতেও বদু মওলানা আবদুল মজিদের মায়ের কথা শুনে কৌতুক করে ওঠে, আপনের মাইয়া না কুমিল্লা থাকে! এবং এরপর সে তার পা ছাড়িয়ে নিয়ে বাড়ির ভেতর চলে যায়। এরপর বদু মওলানাকে তারা দুবছরের আগে আর মহল্লায় দেখে নাই। মোমেনাকে আবদুল মজিদ চার দিন পর খুঁজে পায় রায়েরবাজারের পশ্চিমপ্রান্তে, বুড়িগঙ্গা নদীর কিনারায়, বালুচরের মতো দেখতে এক মাঠের ওপর। আবদুল মজিদ এখন বুঝতে পারে না এই চার দিন তার আদৌ সংজ্ঞা ছিল কি না। তার এখন শুধু মনে পড়ে খুঁজে খুঁজে সে যখন মোমেনাকে পায়, সেই সময়টিকে। রায়েরবাজারের জনমানবহীন কুমোরপাড়ার ভেতর দিয়ে সে যখন গিয়ে একটি উঁচু ডাঙার প্রান্তে দাঁড়ায়, সে দেখে, বালুচরের মতো কিছু শুকনো মাঠ এবং কিছু জলাভূমি ধার ঘেঁষে পড়ে আছে, আর দূরে রোদের আলোয় চিকচিক করে বিশীর্ণ নদীর জল। এই বালুচরের মতো একটি মাঠে সে মোমেনাকে পড়ে থাকতে দেখতে পেয়েছিল। এই দূরত্বটুকু সে পার হয়ে এসেছিল অথবা বলা যায়, সে এখন বলে যে, এই দূরত্বটুকু পার করে এনে ঈশ্বর তাকে তার মৃত বোনের পাশটিতে স্থাপন করে দেয়। সে তখন তার বোনকে দেখে। তার একটি স্তন কেটে ফেলা, পেট থেকে উরু পর্যন্ত ক্ষতবিক্ষত, ডান উরু কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত চিরে তরমুজের মতো হাঁ করে রাখা; সে চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল, তার পিছমোড়া করে বাঁধা হাত দুটো দেহের নিচে চাপা পড়েছিল, মুখটা ছিল আকাশের দিকে উত্থিত। সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিল, তার বুকের ভেতর হাহাকার করে উঠেছিল, আর সে বিকারগ্রস্তের মতো শুধু 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' ধ্বনি উচ্চারণ করছিল। সে মোমেনার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে আকাশের দিকে খুলে রাখা অর্ধনিমীলিত চোখের ওপর রেখে 'আপা' 'আপা' বলে কেঁদেছিল। আবদুল মজিদ পরে যখন তার মেয়ের নাম রাখে মোমেনা, সে তা এই কারণে করে না যে, সে মোমেনার নাম ভুলে যাচ্ছে; বরং এই কারণে যে, এই নামটি ভুলে যাওয়ার নয়। আবদুল মজিদের মেয়ের নাম মোমেনা রাখায় মহল্লার লোকদের কি প্রতিক্রিয়া হয়, আদৌ কোনো প্রতিক্রিয়া হয় কি না অথবা তারা আদৌ ব্যাপারটি জানে কি না, তা সে জানতে পারে না। কিন্তু আবদুল মজিদ এ সময় একদিন প্রবল বিস্ময়ের সঙ্গে দেখে যে, একাত্তর সনের স্মৃতি সবচাইতে বেশি মনে রয়ে গেছে বদু মওলানার। বদু মওলানা এই বিষয়টি ভোলে নাই যে, মোমেনাকে রাজাকাররা ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছিল এবং সম্ভবত দেশ মুক্ত হওয়ার পর মহল্লায় ফিরে আলাউদ্দিনের মায়ের তাড়া খাওয়ার পর বুঝতে পারে যে, এই জনগোষ্ঠীও কোনো কিছুই ভুলে যায় নাই। কারণ, যে বদু মওলানা, আবদুল মজিদের সঙ্গে অপ্রয়োজনে কথা বলে না, সে একদিন তাকে রাস্তায় থামিয়ে তার বাচ্চা মেয়ের কুশল জিজ্ঞেস করে এবং তারপর বলে, বইনের নামে নাম রাকছো, বইনেরে ভুলো নাইকা? আবদুল মজিদ যে মোমেনার কথা কোনোদিন ভুলবে না সেটা তো আবদুল মজিদের জানাই আছে। কিন্তু বদু মওলানার কথা শুনে তার যা মনে হয়, তা হলো এই যে, বদু মওলানা জানে আবদুল মজিদরা একাত্তরের নয় মাসের কথা ভোলে নাই। বদু মওলানার কথা শুনে আবদুল মজিদ চিন্তিত হয়ে থাকে। তার মনে পড়ে একদিনের কথা, রায়সাবাজার যাওয়ার পথে স্যান্ডেলের ফিতে ছিঁড়ে গেলে বদু মওলানার ছেলেকে ধন্যবাদ দেওয়া দেখে সে প্রবলভাবে তাড়িতবোধ করেছিল এবং সেদিন আজিজ পাঠান তাকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কাঁধের ওপর হাত রেখে

AMARBOI.COM

বলেছিল যে, সময়ে মানুষকে অনেক কিছু ভুলে যেতে হয়, বাস্তবতা অনেক সময় বড় হয়ে ওঠে। আবদুল মজিদ এখন বরং দেখতে পায়, মানুষ কেউই কিছু ভোলে না এবং বদু মওলানারও এই কথাটি জানা আছে। এই অবস্থায় কয়েক দিনের চিন্তাভাবনার শেষে সে সিদ্ধান্ত নেয় মহল্লা ত্যাগ করে যাওয়ার। এ ব্যাপারে অবশ্য সে তার মা, স্ত্রী এবং দুবোনের স্বামীদেরও মতামত নেয়, তবে লক্ষ্মীবাজারের বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে বাড্ডায় তার শ্বশুরবাড়ির কাছে গিয়ে নতুন বসত শুরু করার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থাকে। কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করে তার মনে হয়, এটাই একমাত্র যৌক্তিক সিদ্ধান্ত। প্রথমত, সে চায় না, তার মেয়েটি তার বোনের মতো বদু মওলানা কিংবা তার ছেলেদের জিঘাংসার শিকার হোক এবং তার মনে হয়, বাস্তবতা এভাবে এগোলে এ রকম যে ঘটবে না তা কেউ বলতে পারে না। তার মনে হয়, বদু মওলানা একাত্তর সনের সেই একই রাজনীতির চর্চা করে এবং সে এখনো জানে আবদুল মজিদ এবং তার পরিবার মোমেনার মৃত্যুর জন্য এখনো তাকে ঘৃণা করে। তার মনে হয়, এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় বদু মওলানা এবং তার দল সুবিধে করতে পারলে তারা আবদুল মজিদকে ছেড়ে দেবে না এই ঘৃণার জন্য। তবে আবদুল মজিদ এটাও বুঝতে পারে যে, বদু মওলানার সে সুযোগ ঘটলে মহল্লার প্রায় সব লোকই আবার তার সেই পুরনো চেহারাটা দেখতে পাবে; কিন্তু এই ভয়ে একটি মহল্লার সব অধিবাসী বাড়িঘর বিক্রি করে পালাতে পারে না। তা সত্ত্বেও, আবদুল মজিদ ঠিক করে যে, মহল্লার সব লোকের কি হবে তা নিয়ে চিন্তা করে তার লাভ হবে না, সে প্রথমে নিজেকে বাঁচাতে চায় এবং কোনো সমষ্টিগত প্রচেষ্টার অবর্তমানে সে তা করতে পারে এখনই মহল্লা ত্যাগ করে। তার এই চিন্তা এবং সিদ্ধান্তের পরিণতিতে ছিয়াশি সনের সাতই জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে আবদুল মজিদদের বাড়ি বিক্রির একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। এবং ধরে নেয় যায় যে, তাদের বাড়ি বিক্রি হয়ে গিয়ে থাকলে লক্ষ্মীবাজারে তাদের নাম অবলুপ্ত হয়েছে। মহল্লার লোকেরা তাদের এই আচরণে প্রথমে হয়তো বিস্মিত হয়; তবে এক সময় তারা হয়তো বুঝতে পারে, কেন আবদুল মজিদ মহল্লা ছেড়ে চলে যায়, অথবা এমনও হতে পারে যে, আবদুল মজিদের এই সংকটের বিষয়টি মহল্লায় এবং দেশে হয়তো কেউ-ই আর বুঝতে পারে নাই।